গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ২২ সংখ্যা ১ - ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন

বাইরের জাঁকজমকে ভিতরের দৈন্য ঢাকা পড়ল না

মহাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল সিপিএমের ২১তম রাজ্য সম্মেলন। ১৩ জানুয়ারি রাজ্যকে প্রায় অচল করে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া শত শত বাসে করে লোক এনে ব্রিগেডে প্রকাশ্য সমাবেশও অনুষ্ঠিত হল। অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার মতো লোক এনে সিপিএম নেতারা রাজ্যবাসীকে দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা যা-ই করুন না কেন, রাজ্যের মানুষ তাঁদের সাথেই আছে। সেটা অবশ্য হয়নি, সমাবেশ তেমন জমেনি। সংবাদমাধ্যম-গুলিতেও সে কথা প্রকাশিত হয়েছে। তাই সিপিএম নেতারা আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। সিপিএম নেতারা বিশ্বায়নী নীতির সাথে কতখানি একাত্ম হয়ে উঠেছেন, তা বোঝাতেই এবার তাঁরা সম্মেলনের পতাকা তুলেছেন রিমোট কন্ট্রোলে।

সিপিএমের এই সম্মেলন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যখন পুঁজিবাদী সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট রাজ্য তথা দেশের সাধারণ মানুষের জীবন অসংখ্য সংকটে জর্জরিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একতরফা আক্রমণে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলি সাময়িক হলেও পিছু হটেছে, শ্রমিক-কৃষকের জীবনে শোষণ-আক্রমণ আরও মারাত্মক আকারে নেমে এসেছে। এ দেশেও পুঁজিপতিশ্রেণী বিশ্বায়ন ও উদারনীতির অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে চূড়ান্ত আক্রমণ নামিয়ে এনেছে শ্রমিক-কৃষক সহ সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের উপর। শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত অধিকারগুলি নির্বিচারে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আট ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-১২ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, বাড়ানো হচ্ছে কাজের বোঝা। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতনও দেওয়া হচ্ছে না, কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ন্যায্যত প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি। 'সেজ' আইনের মধ্য দিয়ে এমনকী দাবি করার, সংগঠিত হওয়ার অধিকারও কেড়ে নিয়ে তাঁদের প্রায় দাস-শ্রমিকে পরিণত করা হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে অবাধে ঢুকছে বৃহৎ পুঁজি; চুক্তি চাষ এবং কৃষিপণ্যের আগাম বাণিজ্যের নামে দাদনের ফাঁসে পড়ে কৃষক বাঁধা পড়ছে পুঁজির শিকলে। এমনিতেই সার, বীজ ও কৃষি সরঞ্জামের উৎপাদন এবং মূল্য নির্ধারণ বৃহৎ পুঁজির কুক্ষিগত। তাদের অতি-মুনাফার বীভৎস লালসা চরিতার্থ করতে কৃষকের জীবনে দুর্দশার অন্ত নেই, অভাব-হাহাকার নিত্যসঙ্গী। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কৃষকের অভাব মেটে না। আত্মহত্যা আজ দেশজুড়েই কৃষকদের ভবিতব্যে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ পথে বসাতে চলেছে দেশের কয়েক কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ এবং সরকারি পরিষেবার অবলুপ্তিতে সাধারণ মানুষ ন্যূনতম সুযোগগুলি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে অনাহারের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা সপরিবারে আত্মহত্যা করছে। এ রাজ্যও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির থেকে এতটুকু ব্যতিক্রম নয়। একটি বাম নামধারী সরকার তিরিশ বছর রাজত্ব করার পরও রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষ এই সমস্যাগুলিতে সমানভাবে জর্জরিত।

সিপিএমের সম্মেলনে কি মজুর-চাষী-সাধারণ মানুষের এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হল? মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিদের তীব্র ঘৃণা কি সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়েছে? সম্মেলন থেকে কি মালিকশ্রেণীর বেপরোয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে? না, বাস্তবে এমন কিছুই ঘটেনি। গণশক্তি এবং অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে সম্মেলনের খবর যা প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি। বাস্তবে কিছু সমস্যা নিয়ে মামুলি কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, যা এমনকী একটা বুর্জোয়া দলের সম্মেলনেও হয়ে থাকে। বরং, শ্রমিক-কৃষক সহ দেশের শোষিত মানুষের সমস্যা নিয়ে যত না আলোচনা হয়েছে, তার থেকে বেশি আলোচনা হয়েছে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কীভাবে দলকে জেতানো যাবে, কীভাবে পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিতে পার্টিকে এককাট্টা করা যাবে তা নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের সমস্যা জর্জরিত জীবনে আশার আলো দেখানোর মত এই কিছুই সম্মেলন থেকে পাওয়া যায়নি।

সাতের পাতায় দেখুন

আইএলও'র সমীক্ষা রিপোর্ট

২০০৮ সালে বিশ্বে আরও ৫০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট নামধারী সিপিএম দল যখন 'উন্নয়নের' জন্য পুঁজিবাদী পথের জয়গান করছে, তখন বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদের কঙ্কালসার চেহারাটা আর একবার প্রকাশ পেল সদ্য প্রকাশিত আইএলও রিপোর্টে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বা আইএলও আদপেই কোনও বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী সংগঠন নয়। পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে 'শ্রমিক কল্যাণে'র মতাদর্শ নিয়ে এই সংগঠন পরিচালিত হয়। দেশে দেশে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, মজুরি, কর্মসংস্থানের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে এই সংস্থা নানা সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। সদ্য তারা প্রকাশ করেছে 'গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস্' বা বিশ্বে কর্মসংস্থানের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তাদের সমীক্ষার রিপোর্ট।

সমীক্ষায় তারা বলেছে, ২০০৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে যতটুকু স্থিতিশীলতা ছিল, ২০০৮ সালে তা থাকবে না, যার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছে। এর দ্বারা সর্বপ্রথমেই যে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের অভ্রান্ততা পুনরায় প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ আর স্থিতিশীল, প্রগতিমূলক বা সমাজের পক্ষে কল্যাণকারী একটি ব্যবস্থা নয়। এর প্রতিটি অঙ্গ আজ সংকটগ্রস্ত, কখনও বাজার ভাল, উৎপাদন তেজি তো পরমুহূর্তেই বাজারে মন্দা, উৎপাদন নিম্নমুখী। এর ফলাফল বা আঘাত সমাজজীবনে পড়বেই, এবং পড়ছেও। এই আঘাতের বর্শামুখ সরাসরি গিয়ে বিঁধছে শ্রমিকদের। শ্রমজীবী মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আইএলও রিপোর্ট বলেছে, ২০০৮ সালে বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে শ্লথগতি বা মন্দা দেখা দেবে, তার ফলে বিশ্বে বেকারের হার বেড়ে মোট কর্মক্ষম মানুষের ৬.১ শতাংশ পৌঁছবে — সংখ্যার হিসাবে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির বা গ্রোথের কোনও সুফল যে সাধারণ মানুষের জীবনে বর্তায় না, তারও নমুনা পাওয়া গেছে আইএলও রিপোর্টে। বলা হয়েছে, ২০০৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে গ্রোথের হার ৫.২ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও, তার কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বেকারত্বের ক্ষেত্রে পড়েনি, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা বেকারির হার কমেনি। শ্রম করতে পারার মতো বয়সের জনসংখ্যার ৬১.৭ শতাংশ, বা ৩০০ কোটি মানুষ ২০০৭ সালে কোনও না কোনও শ্রমে বা কাজে নিযুক্ত ছিল। বেকারের হার ৬ শতাংশে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেরালাতেও উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম

শুধু নন্দীগ্রাম নয়, কেরালার চিন্নাকানাল গ্রামেও দেশি-বিদেশি মালিকদের পর্যটন ব্যবসা ও হোটেল ব্যবসার জন্য ঐ রাজ্যের সিপিএম সরকার এলাকার মানুষদের উচ্ছেদ করছে, চলছে উপজাতি ও দলিত- নিধন, জোর করে ভিটেমাটি কেড়ে নেওয়া। এর প্রতিবাদে মানুষের বিক্ষোভ ব্যাপক রূপ নিচ্ছে, নিজেদের জমির দখল বজায় রাখতে চলছে মরিয়া লড়াই। রাজ্যের সরকারে আসীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এল ডি এফ) — যার শিরোমণি সিপিআইএম — ক্ষমতায় আসার পরপরই পর্যটন ব্যবসার উন্নতি ও হোটেল ব্যবসার স্বার্থে জমির ন্যায্য অধিকারী উপজাতি ও দলিতদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে-পড়া এবং চূড়ান্ত আর্থিক সংকটগ্রস্ত মানুষরা কিন্তু পিছু হটেনি। তারা উচ্ছেদের প্রতিবাদে গড়ে তুলেছে অধিকার রক্ষা সমিতি। এই সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলন করে শুধু চিন্নাকানাল নয়, কাল্লুর ও চিঙ্গারাতেও তারা নিজেদের জমি সরকারের কাছ থেকে আদায় করেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষ কাল্লুরে, ২০,০০০ আদিবাসী পাথানামথিট্টা জেলার চেঙ্গেরা রাবার এস্টেটে এবং চিন্নাকালান-এ ১৫০টি পরিবার জমির দখল নিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েক বছর আগে। ২০০৩ সালে উপজাতিদের লাগাতার বিক্ষোভে বাধ্য হয়ে এল ডি এফ সরকার ৭০০ পরিবারের প্রতিটির জন্য চিন্নাকানাল-এ ১ একর জমি প্রদান করার কথা ঘোষণা করে। চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ৫৪০টি পরিবার জমির দখল পেলেও বাকি পরিবারগুলি পায়নি। এর প্রতিবাদে লাগাতার ধর্মঘট চলে। অনুন্নত জাতি-উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী এ কে বালান একমাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি মন্ত্রীমহোদয়। বাধ্য হয়ে গত ২৩ নভেম্বর ১৫০টি আদিবাসী পরিবারের মহিলা, শিশুরা মিলিতভাবে চিন্নাকানাল-এ 'হিন্দুস্তান নিউজপ্রিন্ট লিমিটেড'-এর ১৫০০ একর জমি দখল করে নেয়। ২৬ নভেম্বর স্থানীয় সিপিএম কর্মীরা সেখানে ঢুকে পাঁচিল তুলে দিয়ে ঐ এলাকাকে নিজেদের অঞ্চল বলে দাবি করে এবং সর্বত্র দলের পতাকায় মুড়ে দেয়। আগের দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতি পালন না করলেও এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের স্বার্থের ধুয়ো তুলে আসর মাত করতে নেমে পড়ে রাজ্যের সিপিআই এবং কংগ্রেসও। এই অঞ্চলকে তারাও নিজ নিজ দলের মুক্তাঞ্চল বলে দাবি করেছে। নেতাদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে এই নিয়ে। বিরোধী নেতা ওমেন চন্ডী বলেছেন, সিপিএম চিন্নাকালানকে নন্দীগ্রাম বানাতে চাইছে। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন বিরোধী নেতা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছেন ১৮ মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজে কেন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি? সাধারণ মানুষ কিন্তু এসব বাদ-প্রতিবাদে কান দেয়নি। তারা বেছে নিয়েছে লড়াইয়ের পথ, নন্দীগ্রামের মতো হার-না-মানার লড়াই। 'আমাদের উচ্ছেদ করার আগে গুলি করে মারতে হবে' — কাম্বুরের উপজাতি নেতার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী মানুষের স্লোগান — 'জান দেব, তবু জমি দেব না'। (সূত্র ঃ ইন্ডিয়া টু ডে, ১৭-১২-০৭)

অ্যাবেকার সহসভাপতি প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়

মঙ্গল পুরকায়স্থের জীবনাবসান

অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ২১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, "৬০-এর দশকের জাতীয় দল তথা মোহনবাগান ক্লাবের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় মঙ্গল পুরকায়স্থ গত ২০ জানুয়ারি আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি সমাজসেবার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিদ্যুৎগ্রাহক সংস্থা অ্যাবেকার জন্মলগ্ন থেকেই সহ-সভাপতি হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন সহৃদয় অভিভাবককে হারালাম। আমরা অতীত দিনের এই তারকা খেলোয়াড় এবং সমাজসেবীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি।"

১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র মহারাষ্ট্রে

মহারাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি মুম্বইয়ের কাছে গোরাই-মানোরি-উট্টান এলাকায়, যা ধারাভি দ্বীপ নামেও পরিচিত, ৫৭৪০ হেক্টর জমি দখল করে একটি সেজ গঠনের পরিকল্পনা করছে। এর জন্য তারা ১০টি গ্রামের ১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করতে চলেছে। এঁদের বেশিরভাগের জীবিকা হয় চাষাবাদ না হয় মাছধরা। এঁদের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত মানুষও আছেন, যাঁরা এইসব অঞ্চলে বংশপরম্পরায় বহু যুগ ধরে বাস করছেন।

সওয়া লাখ মানুষকে উচ্ছেদ করে মহারাষ্ট্র সরকার যে সেজ গঠন করতে চলেছে, সেখানে কি কল-কারখানা তৈরি হবে? কাজ মিলবে এই উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির? না, সেখানে নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কথা ভাবছে মহারাষ্ট্র সরকার। অঞ্চলটি নাকি একাধারে 'ডিজনিল্যান্ড', 'হলিউড' এবং 'লাস ভেগাস'র সংমিশ্রণ হবে। এই জায়গাগুলি পশ্চিমি কুৎসিত ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং জুয়ার আড্ডা হিসাবে কুখ্যাত, অর্থাৎ ধনীর দুলালদের জন্য দেদার আমোদ-ফূর্তি এবং জুয়ার আড্ডার ব্যবস্থা করা হবে এখানে। ভিটে-মাটি-জীবিকা হারানো মানুষদের সেখানে কোনও স্থান হবে না।

এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এলাকার মানুষ। ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছেন 'ধারাভি বেঠে বাঁচাও সমিতি'। উচ্ছেদ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছে 'গোরাই মচ্ছিমার সমিতি', 'মচ্ছিমার সহকারী সংস্থা' এবং 'ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান সেক্যুলার ফোরাম'র মতো সংগঠনগুলি।

ভিটে-মাটি হারাবার আশঙ্কায় মহারাষ্ট্রের এইসব উচ্ছেদ হতে বসা মানুষগুলি প্রতিদিন মানসিকভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েও ভেঙে পড়েননি, নন্দীগ্রামের লড়াকু জনসাধারণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য কোমর বাঁধছেন তাঁরা। গ্রামবাসীরা বলছেন, 'যুগ যুগ ধরে যে জমিতে বসবাস করে আসছি, কোনও কিছুর মূল্যেই তা দিয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া, আর মায়ের বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

ডোমেনিক ডি মেলো নামে এক কৃষক বলেছেন, "আমাদের পূর্বপুরুষের উর্বর জমি কেড়ে নিয়ে সরকার ধনীর দুলালদের জন্য ফূর্তির ব্যবস্থা করছে। এই জমি রক্ষার জন্য আমরা, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব।" এ তো নন্দীগ্রামের কৃষকদেরই প্রতিধ্বনি।

পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারের মতো মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস- এন সি পি সরকারের মন্ত্রী ও আমলারাও চাষী ও মৎস্যজীবীদের নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাজস্ব ও অরণ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বলেছেন, সমস্ত জমি সরকারের এবং সেই জমি নিয়ে যা খুশি করার অধিকার সরকারের আছে। প্রস্তাবিত 'সেজ' এলাকায় বিনোদন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য মহারাষ্ট্রের 'ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' যে 'প্যান ইন্ডিয়া পর্যটন লিমিটেড'-এর সঙ্গে জোট বেঁধেছে, সেই প্যান ইন্ডিয়ার কর্তারা 'উন্নয়নে'র ধুয়া তুলে বলেছেন, কায়েমী স্বার্থবাজরা রাজ্যের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। বলেছেন, 'এখানে ইকো-ট্যুরিজম-এর কেন্দ্র তৈরি করে আমরা স্থানীয় মানুষের উন্নতি ঘটাব'। মেহনতি মানুষের রক্ত শুষে মুনাফা লোটে যে পুঁজিপতিরা, তাদের এবং তাদের সাকরেদদের মুখে প্রায়শই জনগণের উন্নয়নের এহেন বাণী শোনা যায়, ঠিক যেমনটি শোনা যাচ্ছে, সিঙ্গুরে মোটর কারখানা খোলা প্রসঙ্গে রতন টাটা এবং তাঁর কৃপাধন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখে।

মহারাষ্ট্রের উচ্ছেদ হতে বসা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মেহনতি জনসাধারণ 'উন্নয়নে'র এই মহিমার কথা জানেন। তাই সরকারি কর্তাদের এইসব মন-ভোলানো কথায় বিশ্বাস না হয়ে তাঁরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়বার শপথ নিয়েছেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, 'এ লড়াই ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের লড়াই — আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব'। (সূত্র ঃ টেলিগ্রাফ, ৩১-১২-০৭)

৫০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে

একের পাতার পর

স্থির ছিল ধরে নিয়ে সেই নিরিখে ২০০৭ সালে বিশ্বে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ছিল ১৯ কোটি। এই পরিমাণটা ২০০৬ সালে ছিল ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ। অর্থাৎ, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি (গ্রোথ) ঘটার পরও কাজ পাওয়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। এ বছরকে মন্দার বছর ধরে নিয়ে পূর্বাভাষেই বলে দেওয়া হচ্ছে, আরও ৫০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে যাবে।

এবার দেখা যাক, 'কাজ' বলতে এখন দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষ যা পাচ্ছে, তার চরিত্র কেমন? আইএলও'র বার্ষিক রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার কর্মসংস্থান চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ২০০৭ সালে সবচেয়ে বেশি চাকরি সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। গত বছর গোটা বিশ্বে নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ, এর ২৮ শতাংশই ঘটেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। এই অংশ পড়ে ভারতে পুঁজিবাদী পথের পথিকরা আহ্লাদিত হয়ে ভাবতে পারেন, তাহলে 'দক্ষিণ এশিয়াই আগামী দিনে বিশাল আর্থিক শক্তিধর অঞ্চল হয়ে উঠবে' — পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যমের এই বিশ্লেষণ কত সঠিক! সিপিএম নেতারাও একথা ভেবে গর্ববোধ করতে পারেন যে, তাদের 'শিল্পায়ন' কর্মসূচি কী ভীষণ সময়োপযোগী; বেকারদের চাকরি দেওয়ার যে প্রচার তারা তুলছেন, সেটাও কত বাস্তবসম্মত।

কিন্তু আইএলও রিপোর্টের পরবর্তী অংশই দক্ষিণ এশিয়ার পুঁজিবাদী দেশগুলিতে 'চাকরি বৃদ্ধির' রহস্যের জাল ছিঁড়ে দেবে। রিপোর্টে বলেছে, দক্ষিণ এশিয়াই হচ্ছে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি 'নিরাপত্তাহীন চাকরির' জায়গা, যার অর্থ এখানে যেসব কাজে মানুষ নিযুক্ত আছে, অথবা নিযুক্ত হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ। এই অঞ্চলে প্রতি ১০ জন শ্রমজীবীর মধ্যে ৭ জনই হচ্ছে হয় স্বনিযুক্ত শ্রমিক, না হয় পরিবারগতভাবে শ্রমদান করে। কাজের এই চরিত্রটি বলে দেয় যে, এদের চাকরির কোনও নিরাপত্তা নেই, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মেডিকেল, পেনশন-এর কোনও বালাই নেই, কাজের ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। অর্থাৎ, সংখ্যায় এই বিশাল শ্রমজীবী মানুষগুলি হচ্ছে অতি দরিদ্র। এই হচ্ছে চাকরির সংখ্যাবৃদ্ধির পিছনকার কাহিনী।

আইএলও'র রিপোর্টেই বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী 'ডিসেন্ট' বা মোটের উপর ভালো কাজের সংখ্যায় 'বিপুল' ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ৫ জনই নিযুক্ত রয়েছে এমন ধরনের কাজে, যেখানে শ্রমিকের কোনওরকম নিরাপত্তা নেই। চাকরির নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীন বিপুল সংখ্যক এই শ্রমজীবীরা অতি সামান্য আয়ে কোনওরকমে দিনাতিপাত করেন।

এদের আর্থিক অবস্থা কেমন, তা বোঝাতে আইএলও রিপোর্টই বলেছে, বিশ্বের প্রায় ৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমিক — অর্থাৎ বিশ্বে মোট শ্রমিকের ১৬.৪ শতাংশ এখনও পর্যন্ত যা আয় করেন, তা দৈনিক জনপিছু ১ ডলারেরও কম। দৈনিক জনপ্রতি ১ মার্কিন ডলার আয় হচ্ছে দারিদ্রসীমা। আর, প্রায় ৪৩.৫ শতাংশ শ্রমিক, বা ১০০ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক কীরকম আয় করেন? এদের আয় দৈনিক ২ মার্কিন ডলার থেকেও কম, যেটা মার্কিন দারিদ্র সীমারেখা।

আর একটি তথ্য লক্ষ্য করার মতো। পুঁজিবাদী উৎপাদন ও চাকরির চিত্রে ২০০৭ সালেও দেখা গেছে, গোটা বিশ্বে যতটুকু চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে — সেটা শিল্পে নয়, হচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রে। এই 'পরিষেবা ক্ষেত্র' বা সার্ভিস সেক্টরের ব্যাপ্তি বিরাট, বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের অসংখ্য কাজ এই ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। আইএলও'র সমীক্ষা দেখিয়েছে, বিশ্বে মোট কর্মসংস্থানের ৪২.৭ শতাংশ রয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে ৩৪.৯ শতাংশ কৃষিতে, আর শিল্পে চাকরির অংশ মাত্র ২২.৪ শতাংশ। শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে ঐ রিপোর্ট বলছে, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত শিল্পে যে অধোগতি বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছিল, সম্প্রতি তা যেন সামান্য হলেও এগোচ্ছে। আইএলও'র এই রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর মার্কিন অর্থনীতিতে ব্যাঙ্কের পুঁজির সংকটকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে যে নতুন ধস নামছে, এবং তার প্রভাব ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশে যা বর্তেছে এবং আরও বর্তাবে, তার ধাক্কায় শিল্পের ঐ সামান্য অগ্রগতি যে অতি শীঘ্রই গোঁত্তা খেয়ে আবার পিছনে হাঁটবে, তা বলাই বাহুল্য।

এই অবস্থায় পুঁজিবাদী পথে রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়ে যাঁরা বেকারদের চাকরি দেওয়ার স্বপ্ন ফেরি করছেন, তাকে ধাপ্পা ছাড়া আর কী বলা যায়? শুধু সিপিএম নয়, যে রঙের যে দল বা ব্যক্তিই হোক, যারাই আজ পুঁজিবাদী পথে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও বেকারদের চাকরি দেওয়ার কথা বলবে, তাদের এককথায় পুঁজিবাদের দালাল বলে ঘৃণা করতে হবে।

সর্বশেষে, আইএলও'র রিপোর্টটা পড়ে দেখতে অনুরোধ করব তাঁদের, যাঁরা বলে বেড়ান, "পুঁজিবাদের চরিত্র বদলে গিয়েছে, এখন প্রযুক্তি এসে শ্রমিকের চেহারা পাল্টে দিয়েছে, শোষণ আগের মতো নেই, অতএব মার্কসবাদ অচল, শ্রমিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্র অচল।"

(সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান ২৩-১-০৮)

বার্ড-ফ্লু ঃ ৩১ লক্ষ পোলট্রি ধ্বংসের মুখে

রাজ্যের ২ কোটি ১০ লক্ষ পোলট্রির মধ্যে সিংহভাগই ছোট পোলট্রি। গ্রামের বেকার যুবক ও গৃহবধূরা মূলত এই ছোট পোলট্রি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ইতিমধ্যে রাজ্যের ৩১ লক্ষ ছোট পোলট্রি বার্ড-ফ্লুর ধাক্কা সামলাতে না পেরে ব্যবসা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পোলট্রি পিছু ৩ জন করে ধরলেও তা সরাসরি আঘাত হানবে প্রায় ১ কোটি কর্মসংস্থানে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম বলেছেন, ২১ লক্ষ মুরগি নিধনের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে ১ কোটির উপর ছোট পোলট্রি উঠে যাবে। বেকার হবেন অন্তত ৩ কোটি মানুষ। অথচ এই মুরগি না মেরেও উপায় নেই। পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর রূপ নিল কীভাবে? সরকারই বা কী দায়িত্ব পালন করেছে? প্রশ্ন রাজ্যবাসীর।

ভাইরাস ঘটিত অসুখ বার্ড-ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে এ রাজ্যে মুরগির যে ভয়াবহ মড়ক শুরু হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। মহারাষ্ট্র সরকার ২০০৬ সালে এক সপ্তাহের মধ্যেই যদি বার্ড-ফ্লু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যদি মণিপুর পারে, তাহলে রাজ্যের সিপিএম সরকার এক মাসেও পারছে না কেন? কোথায় তার ব্যর্থতা? কেন ব্যর্থতা? জানুয়ারির ২/৩ তারিখ নাগাদ প্রথম বীরভূমের ৫টি ব্লকে এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে সংক্রামিত বার্ড-ফ্লু নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার যদি তৎপরই হয়ে থাকে, তাহলে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত তা ১৩টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ল কীভাবে? এই বার্ড-ফ্লু শুধু অর্থনৈতিক সংকটই ডেকে আনছে না; কাক, চিল, প্যাঁচা, পায়রা সহ অন্যান্য পরিযায়ী পাখিগুলিও এর আক্রমণের মুখে পড়েছে। পাখি থেকে পাখিতে সংক্রামিত হয়ে রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। মানুষও এর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে নদীয়ার একজন এই রোগে মারাও গেছে। আক্রান্ত পাখি ঘাঁটাঘাঁটি করলে, পাখির মল শরীরে লাগলে, মাংস বা ডিম কম সেদ্ধ করে খেলে মানুষের শরীরে এর সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা। গত কয়েক বছরে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বার্ড-ফ্লুতে আক্রান্ত মানুষদের অর্ধেকই মারা গেছে। ফলে এই রকম একটি মারণরোগ নিয়ন্ত্রণে যে তৎপরতা নিয়ে রাজ্য সরকারের নামা দরকার ছিল, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত অপরাধ তুল্য অবহেলা দেখিয়েছে।

বার্ড-ফ্লু নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন পর্যন্ত নিধনপদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। যে অঞ্চলে এই রোগের উপসর্গ পাওয়া যায় সেই এলাকায় তিন কিলোমিটার ব্যাসের মধ্যে হাঁস-মুরগি সহ সমস্ত পাখি মেরে ফেলে চুন ও ফরমালডিহাইড দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। রাজ্য সরকার এ কাজে চূড়ান্ত অবহেলার পরিচয় দিয়েছে।

মুরগি আমাদের খাদ্য তালিকার একটা প্রধান উপাদান। সংক্রমণের জন্য মুরগির মাংস বা ডিম খাওয়া কমিয়ে দিলে বা বন্ধ করে দিলে উপভোক্তাদের হয়তো বিশেষ ক্ষতি কিছু হবে না, কিন্তু এই ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কী হবে? দেশি মুরগির চাষ আমাদের দেশে বহু দিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু ব্রয়লার মুরগি আসার পর পেশা হিসাবে মুরগি পালনে হাজার হাজার বেকার যুবক যুক্ত হয়েছে। এদের কী হবে? যারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি সঞ্চয় করে বা কোনও কিছু বিক্রি করে পুঁজি জমিয়ে এই ব্যবসায় নেমেছে, তাদের কী হবে? সরকার এ বিষয়ে আগে থেকে কিছুই ভাবেনি। মুরগির মড়ক লাগলে চিকিৎসা কী হবে সে ব্যাপারেও ছিল সরকার উদাসীন।

স্বাধীনতার ৬০ বছরেও পূর্বতন কংগ্রেস শাসনে এবং বর্তমানে ৩১ বছরের সিপিএম শাসনে রাজ্যে মুরগির অসুখ নির্ণয়ের জন্য একটি ল্যাবরেটরি তৈরি হয়নি। তাহলে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ দফতর কী ভূমিকা পালন করছে? প্রাণীসম্পদ দফতরের অবহেলা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে তারা মুরগির মড়কের খবর সময়মতো পাঠায়নি। জানুয়ারির ২/৩ তারিখ নাগাদ বীরভূমের মাড়গ্রামে মড়ক দেখা দিলে মুরগির দেহরস সংগ্রহ করে ভোপালে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে পাঠানো হল ১১ জানুয়ারি। কেন ৮/৯ দিন দেরি করা হল? সরকার কেন বিষয়টিকে চেপে রাখল? কেন গুরুত্ব দিল না? কেন দ্রুত নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠায়নি? এ বিষয়ে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিভাগের সচিবের বক্তব্য হল, 'দু-একটা মুরগি মারা গেলেই যদি ভোপালে নমুনা পাঠাতে হয়, তাহলে ল্যাবরেটরি তো জ্যাম হয়ে যাবে''। এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বার্ড-ফ্লুর বিপদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা কতটা উদাসীন ছিল। যাদের দায়িত্ব ছিল নমুনা পাঠানো, তারা না পাঠিয়ে, নিজের দায়িত্ব পালন না করে, পাঠালে কী হতো তা ভাবতে বসলো, যেটা ভাবা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। এ বিষয়ে প্রাণীসম্পদ বিভাগ গুরুতর অপরাধী।

১২ জানুয়ারি ভোপালের ল্যাবরেটরি প্রাথমিকভাবে তাদের রিপোর্টে জানিয়ে দেয় বার্ড-ফ্লু সংক্রমণের কথা। এই সংবাদ পাওয়ার পর যে তৎপরতায় মুরগি নিধনে নামা দরকার ছিল, সে ক্ষেত্রেও ছিল রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত গড়িমসি। সরকার এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করেনি। নিয়োগ যে করেনি তা স্বীকার করেছেন স্বয়ং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব। তিনি বলেছেন, 'এখনই যদি মুরগি নিধনে প্রচুর সংখ্যায় কর্মী নামানো হয়, তাহলে মুখোশ ও পোশাকের সমস্যা হবে'' (সংবাদ প্রতিদিন ২৩.১.০৮) এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার, সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনও পরিকাঠামোই মজুত রাখেনি। মুখোশ নেই, পোষাক নেই, চুন অপর্যাপ্ত, ব্লিচিং পাউডার অপর্যাপ্ত, কর্মীদের প্রশিক্ষণের অভাব — সব মিলিয়ে বিপর্যয় মোকবিলায় রাজ্য সরকারের এক নৈরাজ্যকর অবস্থা। বার্ড-ফ্লুর সংক্রমণ কি কোন অজানা, অচেনা রোগ? মুরগির যে এরকম রোগ হয় তা তো জানাই ছিল। তাহলে পরিস্থিতির মোকাবিলার উপযুক্ত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা রাখা হয়নি কেন?

রাজ্য সরকার বার্ড-ফ্লু নিবারণ কর্মসূচিকে চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে। সরকার 'মুরগি নিধন করো' হুকুমনামা দিয়েই খালাস। মুরগি নিধনের জন্য হাজার হাজার গরিব মানুষের যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে, সে ব্যাপারে সরকার কী ভূমিকা নিয়েছে? আর্থিক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না করলে যে মুরগিনিধনে গ্রামের মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দেবে না, তা বোঝা কি দুঃসাধ্য ছিল? যারা ঋণ করে, কষ্টেসৃষ্টে পুঁজি যোগাড় করে এই ব্যবসায় নেমেছে, তারা তো চাইবেই ব্যবসাকে বাঁচাতে, তারা তো চাইবেই মুরগি না মেরে বিক্রি করে দিতে। কারণ তারা জানে, এই মুরগি মেরে ফেললে তাদের সর্বনাশ। সরকার যদি শুরুতেই ঘোষণা করত, মুরগি মেরে ফেললে সরকার তাদের পাশে দাঁড়াবে, তাহলে পোলট্রি মালিকরা স্বেচ্ছায় মুরগি নিধনে সামিল হত। এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সরকারের ভূমিকা কী? যে বীরভূম জেলায় সংক্রমণের সূচনা, সেখানকার জেলাশাসক তপন সোম বলেছেন, ''এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশিকা পাইনি।'' কাটোয়ার কংগ্রেস বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ''বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে এ জাতীয় বিপর্যয়ে সাহায্য করার নিয়ম নেই।'' বীরভূমের সিপিএম সাংসদ রামচন্দ্র ডোমেরও বক্তব্য, ''সাংসদ তহবিলের টাকা এ জাতীয় বিপর্যয়ে ব্যবহার করা যায় না'' (আনন্দবাজার, ২৩.১.০৮) গ্রামের মানুষ ক্ষতিপূরণের আশায় পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে যাচ্ছে। কী বলছেন প্রধানেরা? কাটোয়ার শ্রীখণ্ড পঞ্চায়েতের কংগ্রেসী প্রধান শ্যামা মজুমদার, বাঁকুড়ার সালমা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাবের আলি খান, মেজিয়ার অর্ধগ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধান লালচাঁদ সিংহেরা বলছেন, ''পঞ্চায়েতের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উপায় নেই।'' ডি এম বলছেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও নির্দেশিকা নেই, পঞ্চায়েত-এমএলএ-এমপি কেউই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইতিবাচক কোনও কিছু দেখাতে পারছেন না। চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ইতিমধ্যেই মালদার এক মুরগি ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছেন। রাজ্য সরকার উপযুক্ত সময়ে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলে হয়তো এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটত না।

শোনা যাচ্ছে, বার্ড-ফ্লু বিপর্যয় মোকাবিলায় তিন কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রথমে মুরগি মারার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩/৪ লক্ষ। তখনই যদি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মারা হত, তাহলে এই রোগ ছড়াত না। পরের দিকে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ২০-২১ লক্ষ। মাত্র তিন কোটি টাকায় ২০-২১ লক্ষ মুরগি মারা কি সম্ভব? এই পুরো টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিলেও কি তা পর্যাপ্ত? কোথায় এই টাকা? এই টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ আদৌ দেওয়া হচ্ছে না। সংবাদে প্রকাশ, রামপুরহাটের বাজারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হাঁসের দাম যেখানে ১০০/১২০ টাকা এবং স্ত্রী হাঁসের দাম ৮০/১০০ টাকা, সরকার সেখানে ঘোষণা করেছে মাত্র ৪০ টাকা। মুরগির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মুর্শিদাবাদে মুরগির আকার অনুযায়ী ৪০, ৩০, এবং ১০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এমনিতেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কম, তাও আবার নগদে দেওয়া হচ্ছে না। স্লিপ বা কুপন দেওয়ার কথা — যার মাধ্যমে টাকা কবে পাওয়া যাবে কোনও ঠিক নেই। প্রশ্ন হল, কেন এত কম ক্ষতিপূরণ ঘোষণা? সিঙ্গুরে টাটাকে কোটি কোটি টাকা শিল্পের নামে উপহার দেওয়া হলেও গ্রামের গরিবদের হাঁস-মুরগির উপযুক্ত দামটুকু দিতে সরকারের এত অনীহা কেন? আসলে এই সরকার টাটা-বিড়লার সরকার, গরিবের সরকার নয়।

সরকার ঘোষণা করেছে, আক্রান্ত এলাকার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে মুরগির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আক্রান্ত এলাকায় ৩ মাস মুরগি পালন বন্ধ রাখার। নির্দেশ দিলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? হাজার হাজার বেকার যুবক যাঁরা ঋণ নিয়ে হাঁস মুরগি পালন করছিলেন এবং মুরগি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ যাঁরা বার্ড-ফ্লুতে বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়লেন, তাঁদের প্রতি কি রাজ্য সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই? বার্ড-ফ্লু সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত গাফিলতির দায় মাথায় নিয়ে অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে এদের আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনের দাবি —

১। অবিলম্বে নগদে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে হাঁস-মুরগি সরকারকে কিনে নিতে হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় নিধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বার্ড-ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী কর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৩। ক্ষতিগ্রস্ত মুরগি পালক, পোলট্রি ফার্ম মালিক এবং ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ঋণগ্রস্ত পোলট্রি ফার্ম মালিকদের ঋণ সম্পূর্ণ মকুব করতে হবে।

৫। আক্রান্ত এলাকার মানুষের রক্ত বিনামূল্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। রাজ্যে বার্ড-ফ্লু নিবারণের জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে এবং চিকিৎসা পদ্ধতি বের করার জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তৃতীয় ওড়িশা রাজ্য সম্মেলন

সিটুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যখন শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী সংস্কার ও কালাকানুন মেনে নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের বোঝাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ২০ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরে সংগঠনের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে সংস্কারবাদ, অর্থনীতিবাদ, সেজ, শিশুশ্রম, শ্রমআইন সংস্কার ও ঠিকাপ্রথার বিরুদ্ধে এবং কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার, অসংগঠিত শ্রমিক, বিশেষ করে কৃষিশ্রমিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেডক্রস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। কমরেডস্ বিষ্ণু দাস, এস পি মহান্তি ও গোবিন্দ মহারানাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করে। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা। সভায় সংগঠনের পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড তাপস দত্তের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমজীবী জীবন বিপর্যস্তকারী নীতিগুলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক। এর উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। স্পেশাল ইকনমিক জোন-এর বিরুদ্ধে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের (মাইগ্র্যান্ট লেবার) সমস্যা সমাধানের দাবিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা তাঁর বক্তব্যে শ্রমজীবী জনগণের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন।

প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, পুঁজিবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীকে গড়ে তোলা হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য শ্রমিককে আগে নিজেকে পাল্টাতে হবে। সম্মেলনে কমরেড শম্ভুনাথ নায়েককে সভাপতি, কমরেড জগবন্ধু বড়ালকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

পাকিস্তান

বেনজিরের হত্যাকাণ্ড 'বে-নজির' নয়
বে-নজির নয় বিলাওয়ালের নেতা হওয়াও

২৭ ডিসেম্বর প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো যেদিন নিহত হলেন, তার পরের দিন দু'জন মাঝবয়সী পথচারীর কথোপকথন কানে এল। শিক্ষিত ছা-পোষা কেরানি শ্রেণীর ওই দু'জন মানুষের মধ্যে একজন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন — "এরপর কিন্তু মুশারফের পালা।" অপরজন তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললেন — "আরে না, না, ও ব্যাটা মরবে না। দেখবেন, ওর জনসভাতেও বোমা পড়বে, তবে দুশো মিটার দূরে।" বেনজিরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এদেশের দু'জন সাধারণ নাগরিকের এই প্রতিক্রিয়া কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে অসাধারণ। সাধারণভাবে এটাই এ দেশের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার কোনও দিক অগ্রাহ্য করার নয়। একদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অপারঙ্গম হয়েও সাধারণ মানুষ বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন যে, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন (এদেশের পুরাণ-মিথলজি অনুসারে বকাসুর) কখনও তার স্রষ্টাকেও রেয়াত করে না। যেমন ইন্দিরা গান্ধীকে রেয়াত করেনি শিখ সন্ত্রাসবাদীদের গুরু ভিন্দ্রানওয়ালা। অন্যদিকে, মুশারফের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব এবং বেনজির হত্যার পিছনে সরাসরি তাঁর হাত থাকার সন্দেহটি এ দেশের জনমনেও প্রবলভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরপাক খাচ্ছে মূলত বিপাকে পড়া পাক সরকারের অসংলগ্ন আচরণের জন্যই। একের পর এক বদলে যাওয়া সরকারি ভাষ্যে সত্যকে গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা স্পষ্ট। প্রথমে সরকারিভাবেই বলা হল, বেনজিরের ঘাড়ে ও মাথায় মোট পাঁচটি গুলি লেগেছে। পরের দিনই বয়ান বদলে বলা হল, গুলিতে বেনজিরের মৃত্যু হয়নি। গাড়ির সানরুফের লিভারে মাথায় আঘাত লেগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মাথায় কীভাবে আঘাত লাগল সে কথাও রয়েছে সরকারি ভাষ্যে। বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের শব্দ শুনে নেত্রী নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। বড় হাস্যকর পার্শ্ব পরিবর্তন। আত্মঘাতী হামলায় মারা যাওয়া, আর হামলা থেকে 'নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে' মারা যাওয়ার মধ্যে তফাৎ কতটুকু? তা-ও মানা যেত, যদি দেখা যেত যে সরকারি ভাষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কারিগরি ভাষাটুকু অন্তত স্থান পেয়েছে। সে সুযোগটুকুও রাখেনি মুশারফের সামরিক সরকার। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য মৃতদেহের পোস্টমর্টেম বা ময়নাতদন্ত যেখানে অপরিহার্য, সেখানে তা না-করেই দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। সরকারি সাফাই হিসেবে বলা হয়েছে — বেনজিরের স্বামীর আপত্তিতেই ময়নাতদন্ত করা হয়নি। অন্যদিকে রাওয়ালপিণ্ডি হাসপাতালের পরিচালন কমিটির সদস্য তথা বিশিষ্ট আইনজীবী আতাহার মিনাল্লাহ-ই 'দি নিউজ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রাওয়ালপিণ্ডির পুলিশ-প্রধানের চাপেই হাসপাতালের চিকিৎসকরা ময়নাতদন্ত করতে পারেননি। সরকারি তরফে প্রচারিত 'লিভার' তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়ে পিস্তলধারী আততায়ীর ছবি ছেপে দিয়েছে পাকিস্তানের বিখ্যাত দৈনিক 'ডন'। বিদেশি ফটোগ্রাফার জন মুরের তোলা ওই ছবির ভিডিও ফুটেজও দেখানো হয়েছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে। সুতরাং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে আড়াল করার সরকারি অপপ্রয়াস সকলেই ধরতে পারছেন। তবে বেনজিরের খুনিরা এবং খুনের পিছনে থাকা পাকা মাথারা কোনদিনও ধরা পড়বে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর।

বঙ্গীয় সংবাদমাধ্যমের একটি অর্বাচীন অংশ বেনজিরের হত্যাকাণ্ডকে 'বে-নজির' বা 'নজিরবিহীন' বলে আখ্যায়িত করেছে। আসলে বাক্যের মধ্যে অনুপ্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সংবাদ শিরোনামকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার লোভেই বোধ করি এমনটা করা হয়েছে। নইলে কোনও অর্থেই বেনজিরের হত্যাকাণ্ড 'বে-নজির' নয়। রাওয়ালপিণ্ডির যে ময়দানে বেনজির সেদিন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, সেই ময়দানেই আজ থেকে ৫৬ বছর আগে ১৯৫১ সালে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। তাঁর নামানুসারে ওই এলাকার নামকরণ হয়েছে লিয়াকত বাগ। প্রথম প্রধানমন্ত্রীর খুনিরা অধরাই থেকে গেছে। বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে বেনজির-পিতা জুলফিকার আলি ভুট্টোকে আইনসম্মত খুন বা ফাঁসিতে ঝোলানোর নেপথ্য নায়ক জিয়াউল হক প্রাণ হারান তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায়। দুর্ঘটনার পিছনে যে ক্ষমতালিপ্সু পাক রাজনীতিকদের অন্তর্ঘাত ছিল তা আজ সকলেই জানেন। না, কেবলমাত্র ফৌজি শাসিত ও মৌলবাদী জঙ্গি কণ্টকিত পাকিস্তানেই নয়, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র'র গর্বে আহ্লাদিত এই ভারতকেও কি বেনজির হত্যার তুল্য নজির ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়নি। ১৯৮৪ সালে দেহরক্ষীর গুলিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যু বা ১৯৯১ সালে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় ইন্দিরা-তনয় রাজীবের প্রাণহানির সাথে বেনজির হত্যার পার্থক্য কতটুকু? বরং ইন্দিরা-রাজীবের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঘেরোটোপ যথেষ্ট আঁটোসাঁটো ছিল, যা বেনজিরের ক্ষেত্রে ছিঁটেফোঁটাও ছিল না। ৮ বছরের স্বেচ্ছানির্বাসন কাটিয়ে গত ১৮ অক্টোবর যেদিন তিনি দেশের মাটিতে পদার্পণ করেন, সেই দিনই করাচিতে তাঁর কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল। অল্পের জন্য সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাণ গিয়েছিল প্রায় দেড়শো জন পাক-নাগরিকের। তবুও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (১৯৮৮-৯০, ১৯৯৩-৯৬) তথা পিপিপি নেত্রীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন তা বোঝা যায় ২৬ অক্টোবর তাঁর মার্কিন মুখপাত্র মার্ক সিজেলকে পাঠানো ই-মেল থেকে। ওই ই-মেলে তিনি বলেন, "১৬ অক্টোবর মুশারফকে চিঠি লিখে আমি কয়েকজনের নাম করেছিলাম। আমার কিছু ঘটলে ওই নামগুলোর পাশাপাশি মুশারফও দায়ী থাকবেন। আমাকে ব্যক্তিগত গাড়ি চড়তে দেওয়া হচ্ছে না, গাড়িতে কালো কাঁচ লাগাতে দেওয়া হচ্ছে না, জ্যামার দেওয়া হচ্ছে না, আমার চারদিক ঘিরে থাকার জন্য পুলিশের চারটে গাড়িও দেওয়া হচ্ছে না। ওঁর ভূমিকা ছাড়া এ হতে পারে না।" (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ ডিসেম্বর, '০৭) এত নির্দিষ্টভাবে নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা করা সত্ত্বেও তাঁর নিরাপত্তার বিষয়ে চরম শিথিলতা প্রদর্শনের ফলে বেনজির হত্যার অন্তত পরোক্ষ দায় মুশারফের ওপর বর্তায় বৈকি। পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন)-এর নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফও সঙ্গতকারণেই কঠোর সমালোচনা করেই বলেছেন — "মুশারফ নিজের নিরাপত্তায় কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারেন, কিন্তু বেনজিরের সুরক্ষায় কিছু খরচ করতে পারলেন না।" (বর্তমান ২৮/১২)

আমাদের দেশে (এবং অন্য দেশেও) সাধারণ মানুষের মধ্যে তো বটেই, এক শ্রেণীর অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধী 'অসাধারণ' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে, একমাত্র নির্বাচিত সরকারই জনগণকে 'গণতান্ত্রিক' শাসন উপহার দিতে পারে। অথচ তথাকথিত এই গণতান্ত্রিক শাসনে আইন-শৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি, লাগামছাড়া দুর্নীতি ও অন্যান্য নানা অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষুব্ধ জনসাধারণকে বলতে শোনা যায় — এই অবস্থায় মিলিটারি শাসনই একমাত্র দাওয়াই। কেউ আবার আরও একধাপ এগিয়ে বলেন — জরুরি অবস্থা ছাড়া অবস্থা পাল্টাবে না। বলা বাহুল্য, এগুলো আদতে ভ্রান্ত রাজনৈতিক চেতনাজনিত উপলব্ধি। মিলিটারি বা ফৌজি শাসনের মহিমা বারংবার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন পাকিস্তানি জনগণ। জনগণের ক্ষোভ বা অসন্তোষ কোন পর্যায়ে পৌঁছালে সামরিক স্বৈর শাসককেও আত্মরক্ষার অবলম্বন হিসেবে জরুরি অবস্থার বর্ম গ্রহণ করতে হয়, তা-ও সম্প্রতি পাকিস্তানে দেখা গেল। আনুগত্যের মাত্রা বিচার করে বিচারপতিদের বহাল-বর্জন করা হল। রাজপথে রক্তাক্ত করা হল প্রতিবাদী আইনজীবীদের। জরুরি অবস্থার দস্তুর মেনে কণ্ঠ রুদ্ধ করা হল সংবাদ-মাধ্যমের। কিন্তু এসবের দ্বারা কখনই তো গণকণ্ঠ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা যায় না। তাই বেগতিক বুঝে পাক-জনগণের চোখে প্রায় নাপাক হয়ে পড়া সামরিক মুশারফের সাথে 'গণতান্ত্রিক' বেনজিরের সমঝোতা করিয়ে দিল রেফারি আমেরিকা। রেফারি বলতে চাইল, উর্দিধারী অথবা উর্দিপরিহারি মুশারফে যদি তোমাদের মন না বসে, তাহলে বেনজির লাও, দেশ বাঁচাও। যে বেনজির নানা দুর্নীতি ও অপশাসনের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আট বছর আগে নির্বাসনে গিয়েছিলেন, যার তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীত্ব আটকাতে ২০০২ সালে মুশারফ সরকার সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করেছিলেন, সেই বেনজিরকেই ফের স্পনসর করল আমেরিকা। উদ্দেশ্য হলো, সামরিক শাসনের দুঃসহ ক্ষতে খানিকটা 'গণতান্ত্রিক' মলম লাগিয়ে সাময়িক উপশম ঘটানো। প্রভু আমেরিকার ইচ্ছায় বেনজিরের উপর থেকে দুর্নীতির মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নিলেন পারভেজ মুশারফ। কিন্তু আমেরিকার অভিভাবকত্বে পরিচালিত বহুজাতিক পুঁজির পাক-চক্র যেমনটা চাইল, তেমনটা আপাতত ঘটতে দিল না মুশারফ-প্রেমী গোয়েন্দা-চক্র আইএসআই। তারা বেনজিরের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করার মধ্যে দিয়ে তাঁর মৃত্যুর সিংহদুয়ার খুলে রাখলেন। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে বেঘোরে চলে যেতে হল পিপিপি নেত্রী তথা মুসলিম দুনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে।

বেনজিরের অকাল মৃত্যুর পর যেভাবে তাঁর ১৯ বছরের কলেজ পড়ুয়া ছেলে বিলাওয়ালকে দলের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হল, যেভাবে তাঁর স্বামীকে কো-চেয়ারম্যান করা হল, সেটাও কিন্তু বে-নজির নয়। এই ঘটনা বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে নাবালক আকবরের সম্রাট হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণের পর আকাশ থেকে রাজীবকে নামিয়ে আনা বা রাজীবের পর গৃহবধূ সোনিয়াকে নেত্রী করা বা সোনিয়ার উপস্থিতিতেই পুত্র রাহুলের অভিষেক। মধ্যযুগের অগণতান্ত্রিক সুলতানি আমলে প্রচলিত পরিবারতন্ত্র একবিংশ শতাব্দীতেও গণতন্ত্রের চাদর জড়িয়ে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোতে এখন আর সর্ববাদীসম্মত নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না, উপর থেকে নেতা চাপিয়ে দেওয়া হয়। সেটা শালগ্রাম শিলা হলেও চলে! এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অন্তঃসার-শূন্যতাকেই প্রকট করে তুলছে না কি?

(ঝড়, ৭-১৩ জানুয়ারি, '০৮)

হুগলি

সার্কেল ম্যানেজার অফিসে অ্যাবেকার বিক্ষোভ

হয় বিদ্যুতের দাম কমাতে হবে না হলে ভরতুকি দিতে হবে, কৃষকদের মিটার রিডিং দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিতে হবে, অস্বাভাবিক বিল বাতিল করতে হবে ইত্যাদি ১১ দফা দাবিতে ১৬ জানুয়ারি অ্যাবেকা হুগলি জেলা কমিটির ডাকে ৪ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বেলা ১টায় চুঁচুড়া

খাদিনামোড়ে জমায়েত হন। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভায় স্মারকলিপি পাঠ করেন সংগঠনের জেলা কমিটির পক্ষে সিতাংশু তপাদার এবং বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। এরপর বিক্ষোভকারীরা সার্কেল ম্যানেজারের অফিসে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে।

জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, সহ সম্পাদক মণিমোহন ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মহিউদ্দিন মোল্লা সার্কেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সার্কেল ম্যানেজার গত এপ্রিল মাসের বিলটি বিতর্কিত বিল হিসাবে মেনে নেন। তিনি বিলটি স্থগিত করে বাকি বকেয়াগুলি কিস্তি সহ এলপিএসসি বাদ দিয়ে প্রদানের দাবি মেনে নেন। সমস্ত বিতর্কিত বিলগুলি গ্রাহকদের বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার দাবিও মেনে নেন।

আলিপুর জেলে
শহীদ কমরেড আমির আলি হালদার স্মরণসভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশিষ্ট কৃষক ও জননেতা, এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আমির আলি হালদারকে ১৯৯৭ সালের ১১ জানুয়ারি সিপিএমের ঘাতকরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল।

শহীদ নেতার স্মরণে ১১ জানুয়ারি কুলতলির নতুন হাটে স্মরণসভা হয়। কমরেড দীপঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীরাও এদিন এক সভার মধ্য দিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভায় জেলের অন্যান্য বন্দীরাও যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড অশোক চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত।

ভোগবাদ সশস্ত্র দখলদারির চেয়েও মারাত্মক

(আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন উপলক্ষে গত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে কলকাতায় এসেছিলেন আমেরিকার ভূতপূর্ব অ্যাটর্নি জেনারেল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি র‍্যামসে ক্লার্ক। ঐ সময় 'দি হিন্দু' পত্রিকার সাংবাদিক মার্কাস ড্যাম, র‍্যামসে ক্লার্কের সাথে বিশ্বায়ন, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি, ইরাক যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৭ ডিসেম্বর 'দি হিন্দু' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। মূল্যবান এই সাক্ষাৎকারটি আমরা বাংলায় প্রকাশ করছি।)

প্রশ্ন - বর্তমানে রাজনৈতিক আলোচনায় 'ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি' বা 'আন্তর্জাতিক সমাজ' বলে যে শব্দগুচ্ছ হরহামেশা ব্যবহার করা চলছে, তার দ্বারা আসলে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যকেই একটু ঘুরিয়ে মোলায়েম করে বলা হচ্ছে — এ কথা যদি কেউ বলেন, তবে আপনি কী জবাব দেবেন?

উঃ - আমি মনে করি, যারা বৃহত্তর বিশ্বায়ন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে চলছে, তারা চায় সমগ্র বিশ্বের জনগণ মানসিকভাবে নিজেদের একই সমাজ বা সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করুক, এতে ঐ বিশ্বায়নবাদীদের কাজ করাটা সহজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন - বিশ্বায়ন মেনে নেওয়ার অর্থ এখন প্রধানত মার্কিন ঢং-এর পুঁজিবাদকে মেনে নেওয়া; এর দ্রুত বিস্তার বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের নতুন করে বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। এই ঘটনাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উঃ - এটা সভ্যতার ক্ষেত্রে, মানবজাতির ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর বিপদ। এ কেবল রাজনৈতিক বিপদই নয়, অবশ্যই অর্থনৈতিক বিপদও। কিন্তু মানুষের জীবনের একেবারে মূল স্তরে এই বিপদটা দেখা দিচ্ছে সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে। যেমন একই প্রযুক্তি, একই ধরনের বিনোদন, একই ফাস্টফুডের খাদ্যাভ্যাসে সকল দেশের মানুষকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক শক্তির উপর দাঁড়িয়ে এই সংস্কৃতিকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে জোর করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভোগসর্বস্বতা ও অর্থলোভের একটা নিজস্ব শক্তি আছে এবং তার সবচেয়ে বড় শিকার সম্ভবত সংস্কৃতি। সংস্কৃতিই একটা জাতির স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা-দুঃখ-ব্যথা যন্ত্রণার ও জনগণের ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। একে ধ্বংস করার ফলাফল তাই মারাত্মক।

প্রশ্ন - কিন্তু, উন্নয়নের যে কথা বলে আমেরিকা আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে বলে অভিযোগ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেই উন্নয়নের বিকল্প পথেরও তো উদ্ভাবন ঘটছে।

উঃ - বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যেসব সমস্যার জন্ম দিয়েছে, আমি দেখছি, সে সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বেড়েছে বিপুলভাবে। একজন আশাবাদী হিসাবে আমি মনে করি, যে দ্রুততায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলছে, তার গতি হ্রাস পাবে এবং তার চেয়েও বড় কথা, এই বিশ্বায়নের প্রকৃত অর্থ কী এবং এক একটি সমাজের ক্ষেত্রে এই বিশ্বায়ন কী সর্বনাশ করছে, সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন - বিশ্বায়নকে অনেক সময় নয়া উপনিবেশবাদের প্রতিচ্ছবি ভাবা হয়। আপনি কি তাই মনে করেন?

উঃ - অতীতের সাম্রাজ্যবাদ ও বর্তমানের নতুন বিশ্বায়নের মধ্যকার পার্থক্যটা ভারতে খুব পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান। এই দেশ বিদেশি শাসনের বর্বরতা ভোগ করেছে। তারই ফল হিসাবে পেয়েছে দারিদ্র ও হাহাকার। কিন্তু বিশ্বায়ন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত যদি আপনি ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি লক্ষ্য করেন, দেখবেন তার মুখমণ্ডলটা ছিল ভারতীয়। এখন বিশ্বায়নের তীব্রতা সমাজজীবনের কোণে কোণে পৌঁছে যাওয়ার পর, এমনকী চলচ্চিত্রের কমেডিয়ানের চেহারা চালচলন, তার রসিকতার বিষয় ও তার উপস্থাপনা, সঙ্গীতের ছন্দ ইত্যাদি সব কিছুই বদলাতে শুরু করেছে।

এ জন্যই ভোগসর্বস্বতা ও টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ির লোভ একটা জাতির ক্ষেত্রে যতটা বিপজ্জনক, দেশটা কোনও বিদেশি শক্তি অস্ত্রের জোরে দখলে নিলেও বিপদ ততটা নয়।

অতীতের ঔপনিবেশিক শাসনে, আপনি অন্তত এটুকু জানতেন যে, শত্রু কারা, সর্বক্ষণ আপনি পিঠে ছোরার ফলার স্পর্শ টের পেতেন। আপনি জানতেন, উন্নততর জীবন চাইলে কী করতে হবে। নতুন ভোগবাদী শাসনে আপনি বন্দী, অথচ আপনি তা বোঝেন না। বন্দী যখন জানে না যে, তাকে শিকলের বেড়ি দিয়ে রাখা হয়েছে, তখন আশা করার কিছু থাকে না। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখবেন — আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সবকিছুই পুরোপুরি বন্দী এবং এখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় বিপদ।

প্রশ্ন - ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি নিয়ে আমাদের দেশে এখন বিতর্ক চলছে, অনেকেই বলছেন, ভারত-মার্কিন সামরিক জোটবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই চুক্তিকে দেখা শিশুসুলভ হবে। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

উঃ - ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং তারা জানে, তারা কী করছে। তাদের ও আমেরিকার মতলব যদিও সম্পূর্ণ আলাদা, তবুও তারা নানা কারণে একত্র হতে পারে এবং বিশ্বায়ন সেখানে উভয়ের কাছেই নিশ্চয়ই খুব মানানসই বিষয়। পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আপনি যদি আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্রশক্তি হন, তবে সম্ভবত একথা ধরেই নেওয়া যায় যে, বিশ্বায়নের জন্য ও সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটানোর জন্য আপনার দরজা পুরোপুরি খোলা থাকবে।

প্রশ্ন - আমরা এখানে পারমাণবিক অস্ত্রচুক্তির কথা নয়, পুরোপুরি অসামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু সহযোগিতার চুক্তির কথা বলছি।

উঃ - প্রযুক্তি যে রকম দ্রুততায় ও কৌশলে জিনিসকে পাল্টে দিতে পারে, তাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির ক্ষমতাও সে দ্রুত আয়ত্ত করে অনায়াসে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং তা দেবেও।

আমরা যদি শান্তির জন্য অন্য কোনও দেশ কর্তৃক পরমাণু অস্ত্র তৈরির বিরুদ্ধতা করার কথা বলি, তবে এখানে কার শান্তির কথা আমরা বলছি — তাদের, অর্থাৎ অধিকতর শক্তিমান দেশগুলির শান্তি, না বিশ্বশান্তি? আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, আমি যদি একমাত্র রাষ্ট্র হই, যার পরমাণু অস্ত্র আছে এবং বিশ্বের যে কোনও স্থানে সেই অস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষমতা আছে, তবে শান্তি আমার একারই থাকবে, অন্য কারও নয়। ''আমি তোমাকে মুছে দেব, তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না'' — প্রতিরক্ষার এই ব্যবস্থাকে কোনও ভাবেই অনুমোদন করা যায় না; এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মেনে নিলে তা মানবজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক হবে।

প্রশ্ন - ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার আন্দোলনে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; ২০০৫ সালে সাদ্দাম হুসেনের ''বিচারের'' সময় তাঁকে সমর্থন করার জন্য ২০০৪ সালে আইনজীবীদের যে প্যানেল করা হয়েছিল, আপনি তার সদস্য ছিলেন। গত কয়েকমাসে ইরাক সম্পর্কে আমেরিকার নীতিতে কী পরিবর্তন ঘটেছে?

উঃ - এই আগ্রাসী যুদ্ধ যদি বিনামূল্যে চালানো সম্ভব হত, ইরাকের ভিতরকার প্রতিরোধ যদি এত প্রবল না হত, আমেরিকাকে যদি এ জন্য বিপুল মূল্য দিতে না হত — শুধু নিহত মানুষের সংখ্যার হিসাবে নয়, বিশ্বে আমেরিকার সম্মান ও খ্যাতির দিক থেকেও এত মূল্য না দিতে হত, তাহলে বোধ হয় এই আগ্রাসী যুদ্ধ বিশ্বশান্তির পক্ষে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। এই মূল্য দিতে হওয়ার ফলেই আমেরিকার আগ্রাসী অভিযানের গতি ব্যাপকভাবে শ্লথ হয়ে গেছে। বেদনাদায়ক ঘটনা হল, আমেরিকার এই আগ্রাসী যুদ্ধ ছিল একটা চরম আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটাও বুঝে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আগ্রাসনের হুমকি দেওয়া ও বাস্তবে আগ্রাসন চালানো — দুটোই আইনের চোখে একই।

অন্যান্য দেশকে আমেরিকা অবাধে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে এবং ভয় দেখাচ্ছে। আপনি যদি ইরাকের মানুষের অবস্থা দেখেন, আপনার হৃদয় ভেঙে যাবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয়ের চেহারা দেখলে আপনি স্থির থাকতে পারবেন না। ইরাকের প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ দেশছাড়া, ১০ লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, ৭৫ শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল নেই। এবং এর সাথে রয়েছে ভীতির ভয়াবহ পরিবেশ। আমরা ইতিপূর্বে কোনও দিন এমন ভীতিময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি — যেকোনও মুহূর্তে খুন হয়ে যাওয়ার ভয়। এই দিকটায় সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং একে রুখবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

প্রশ্ন - আমেরিকা যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে, সেটা কি তারই সৃষ্ট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?

উঃ - সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বেশিরভাগ রাজনীতিকরা মুখে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের দায়ী করছেন, কিন্তু আসলে তারা ইসলাম ধর্মকেই বিপদ হিসাবে দেখাতে চান।

প্রশ্ন - ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেই এই ভীতি কেন? আমেরিকার সমালোচকরা বলেন, মার্কিন সরকার আসলে সন্দেহ অবিশ্বাসের মানসিক রোগে ভুগছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় ছিল কমিউনিজমের বিপদ। এখন বলা হচ্ছে ইসলামের বিপদ।

উঃ - ইসলাম সম্পর্কে বলি, এ একটা বিশ্বাস। একটা সময় যখন সমাজে কোনও মূল্যবোধ ছিল না, ন্যায়নীতি ছিল না, আর্থিক শক্তি, লোভ ও পেশীবলই ছিল প্রধান, তখন ঐ ধর্মবিশ্বাস জনগণের স্বার্থে কাজ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রো-আমেরিকান জনগণকে এই ধর্ম বিশ্বাস স্পর্শ করেছিল। এই গোষ্ঠীর জনগণের জীবন তখন যত্রতত্র হিংসাত্মক কার্যকলাপে ছিন্নভিন্ন, বাঁচার জন্য তারা তখন লড়ছে। সে সময় হঠাৎ ইসলাম ধর্ম তাদের জীবনে আসে এবং তার মধ্যে তারা শান্তি, মর্যাদা ও একটা বিশ্বাসের সন্ধান পায়, যার উপর তারা নির্ভর করতে পারে।

আমেরিকার ভীতিটা অত্যন্ত বাস্তব। বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ হচ্ছে ভোগসর্বস্বতা। অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনসামগ্রীর দ্রুত বৃদ্ধি, যাকে মার্ক টোয়েনের ভাষায় বলা যায় — 'তুমি আরও সামগ্রী তৈরি করতে চাও, আরও জিনিস নির্মাণ করতে চাও, বিক্রি করতে চাও আরও বেশি জিনিস, আরও ধনসঞ্চয় করতে চাও। এর ফল কী হয়? সবচেয়ে মারাত্মক যেটা ঘটে, তাহচ্ছে, প্রতিটি দেশে ধনীদের ধনবৃদ্ধি হয়, আর গরিবের জীবনে নেমে আসে আরও দারিদ্র। বিশ্বব্যাপী গরিবের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটছে আরও বেশি। মানুষের

বাঁচার মতো অবস্থাই এটা নয়।

একটা শত্রু খাড়া করা, নতুন নতুন শত্রুর খোঁজ করা মার্কিন সরকারের দরকার। মার্কিন সরকারের পিছনে গোটা আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, সরকারের আসল মতলবকে আড়াল করার জন্য এবং দেশপ্রেমের আবেদন — যা বজ্জাতদের শেষ আশ্রয়, তাতে জনগণকে ভোলাবার জন্য এটা তাদের প্রয়োজন। দেশপ্রেম এখানে মূল উদ্দেশ্যই নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আধিপত্য কায়েম ও শোষণ। এ কাজে সফল হতে হলে দেশের মানুষকে এককাট্টা করার জন্য আপনার একজন শত্রু থাকা চাই। এটা খাড়া করতে পারলেই সামরিকবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। বিশ্বের সকল দেশ মিলে অস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, আমেরিকা একাই সেই পরিমাণ অর্থ অস্ত্রের পিছনে ব্যয় করে। অন্য দেশ পরমাণু অস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করলে আমেরিকা তাকে দুনিয়া থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি দেয়, অথচ আমেরিকা নিজে নতুন প্রজন্মের পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলছে। নিজের রকেট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে আরও বিধ্বংসী করছে, যা মিনিটের মধ্যে বিশ্বের যে কোনও স্থানে আঘাত করতে পারে।

প্রশ্ন - এ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, নানা দেশ বিভিন্ন অংশে জোটবদ্ধ হচ্ছে মার্কিন আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।

উঃ - আধিপত্য ও দমন কায়েম করাটা খুব কঠিন কাজ। শোষণ করার জন্যই তো দমন। এই পথেই তারা সম্পদ ঘরে তোলে। অন্যকে দমিয়ে রেখে তারা সম্পদ হাতায়। জনগণের দৃষ্টিও তারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়, যাতে তারা পরিবর্তনটা দেখতে না পায়, তাদের কী সর্বনাশ করা হচ্ছে, সেটা তারা ধরতে না পারে। ল্যাটিন আমেরিকার নতুন স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য করুন, বিস্ময়কর লাগবে। ইতিপূর্বে কিউবায় বিপ্লব ঘটেছে। কিউবা — যেন এক যাদুশক্তিতে সেই বিপ্লবকে ধরে রেখেছে। কয়েক দশক ধরে কঠিন অর্থনৈতিক অবরোধ জারি থাকা সত্ত্বেও ঐ দেশেই শিক্ষিতের হার, অঙ্কে নম্বর প্রাপ্তি ঐ গোলার্ধের দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। ভেনেজুয়েলার দিকে, আর্জেন্টিনার দিকে তাকান, কী ঘটছে সেখানে। ব্রাজিল ও চিলির দিকে দেখুন। শৃঙ্খল ভেঙে এ সব দেশ মাথা তুলছে। আমি মনে করি, ভারতও তার শত্রুদের চিনতে ভুল করবে না।.....

কিন্তু সকলের উপর আমাদের দরকার মূল্যবোধে ফিরে আসা — যে মূল্যবোধ নিছক ভোগবাদ থেকে অনেক উন্নত। ভোগবাদ বলে — 'আমি আরও জিনিস চাই, আমি আরও ভাল খাবার চাই, আরও ভাল বাড়ি চাই, বড় গাড়ি চাই; ভোগবাদ শেখায় আমি আমার সন্তানের জন্য বিশ্বের সমস্ত খেলনা কিনে দিতে চাই।''

এর চেয়ে অধঃপতিত জীবন আর কী হতে পারে!

অভূতপূর্ব মানবিক সঙ্কটের মুখে দখলীকৃত ইরাক

মার্কিন দখলীকৃত ইরাকের আজ যা প্রকৃত দশা, তা বাস্তবিকই শিউরে ওঠার মতো। গৃহহীন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা সেদেশে ইতিমধ্যেই ৪০ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে, মৃতের সংখ্যা ছুঁয়েছে ১০ লক্ষ। চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার মুখে। স্কুল-কলেজ বন্ধ, জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তার খোঁজে সে দেশের মানুষ প্রতিদিন হাজারে হাজারে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। সব মিলিয়ে অবস্থা এক কথায় ভয়াবহ।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট প্রচারমাধ্যমে অদ্ভুতভাবে এই সামগ্রিক চিত্রটি একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানে আমরা মাঝে মাঝেই সেদেশের ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক কিছু ঘটনা ও প্রাণহানির খবর পাই বটে, কিন্তু তা সবই যেন কেমন ছাড়াছাড়া, পারস্পরিক যোগসূত্রবিহীন। এইসব খবর পড়লে মনে হতে পারে, প্রতিরোধ আন্দোলনের নামে সে দেশে আজ যা চলছে, তা ব্যাপক হিংস্রতা ও নিছক পাগলামি ছাড়া বুঝি আর কিছু নয়। আর এই যদি হয় প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের চেহারা, মানুষের জীবনের কোনও মূল্যই যাদের কাছে কিছুমাত্র নেই, তবে তার থেকে বুঝি অন্য সব কিছুই ভাল — এমনকী তা বিদেশি দখলদারি হলেও। এইসব প্রচারমাধ্যমেও তাই আমরা পাচ্ছি এই সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা, যার বিষয়বস্তুই হল মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহৃত হলে ইরাকের অবস্থা দাঁড়াবে ভয়াবহ। মার্কিন রাজনীতিকরাও — তিনি রিপাবলিকান কি ডেমোক্র্যাট, যিনিই হোন না কেন — নিতান্ত গোবেচারা মুখে অসহায় বাণী বিতরণ করে চলেছেন যে, তাঁরা কতটা নিরুপায়, ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে কী ভীষণ আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই, ইরাকের মানুষের কথা ভেবেই তাঁদের সে দেশে সেনা মোতায়েন করে রাখতে হচ্ছে, না হলে যে বেচারা ইরাকিগুলো নিজেরাই হানাহানি কাটাকাটি করে মরবে!

কর্পোরেট প্রচারমাধ্যমে তুলে ধরা এইসব আলোচনা ও রিপোর্ট বাস্তব চিত্র থেকে সত্যই অনেক দূরে। আসলে যে বিষয়টি এর মাধ্যমে আড়াল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তা হল ইরাকের আজকের যে প্রকৃত ভয়াবহ অবস্থা, তার জন্য এক ও একমাত্র দায়ী হল মার্কিন দখলদারি। সে দেশ থেকে দখলদার সমগ্র মার্কিন বাহিনীর নিঃশর্ত প্রত্যাহার ও সে দেশের মার্কিন পুতুল সরকারের বদলে প্রকৃত সার্বভৌম ইরাকি সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই অবস্থার পরিবর্তন বাস্তবিকই অসম্ভব।

সে দেশের প্রকৃত অবস্থাটি আজ কী রকম? অক্সফ্যাম ও ৮০টি এইড এজেন্সি এই সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে প্রকাশ, সে দেশের প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ, অর্থাৎ ইরাকের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই আজ এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন যে, জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণের ব্যবস্থা করা ছাড়া তাদের বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। লক্ষ ইরাকি আজ উদ্বাস্তু এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রতি মাসে নতুন করে ঘরছাড়া ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষকে ধরলে, রাষ্ট্রসংঘের রিফিউজি ইন্টারন্যাশনাল দপ্তরের মতে এই উদ্বাস্তু সমস্যা হল সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা উদ্বাস্তু সমস্যা। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল 'ল্যানসেট' ২০০৬ সালের জুন মাসে যে রিপোর্ট বের করে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের ঐ সময় পর্যন্ত ইরাকে মৃত্যুর সংখ্যা ঐ সময়সীমার মধ্যে শান্তির সময়ে স্বাভাবিক মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় মোট ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার বেশি। অর্থাৎ, ঐ সময় পর্যন্ত মার্কিন দখলীকৃত ইরাকে যুদ্ধ পরিস্থিতির বলি হতে হয়েছিল ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার প্রাণকে। ঐ সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ। অক্সফ্যামের রিপোর্টে আরও পাওয়া যাচ্ছে, আজকে ইরাকে বেকারত্বের হার ৫০ শতাংশ। ইরাকের জনগণের ৪৩ শতাংশই আজ চরম দারিদ্রসীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৯০ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০০৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাষ্ট্রসংঘ থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করা হয়। এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকের মানুষের জীবনে প্রবল অভাব নেমে আসে। নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য, খাদ্য ও জরুরি ঔষধপত্রের অভাব সেদিন ছিল সে দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। তবুও, এমনকী সেই সময়েও, ইরাকের মানুষের সাক্ষরতার হার ছিল ১০০ শতাংশ। প্রায় গোটা দেশজুড়ে মরুভূমির বিস্তার সত্ত্বেও ব্যবহার্য ও পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সাধারণ খাদ্য প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলি সবচেয়ে জরুরি ভিত্তিতে জোগান দেওয়া ও রক্ষা করার জন্য সেদিন সংগ্রাম চালানো হয়েছিল। আর আজ সেই ইরাকের ৭০ শতাংশ মানুষই নিরাপদ পানীয় জল পান না, ৮০ শতাংশ মানুষই শৌচব্যবস্থা বলতে কী বোঝায় ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছেন (সূত্র ঃ ইউ এন হাই কমিশন ফর রিফিউজিস)। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন (হু) জানাচ্ছে, এর ফলে কলেরা ও ডায়ারিয়া প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে। কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। অন্তত ৫ লক্ষ উদ্বাস্তু শিশুর সামনে শিক্ষার দরজা বন্ধ। অসংখ্য স্কুল ও কলেজ উঠে গেছে। কারণ সেইসব শিক্ষায়তনের বিল্ডিংগুলিতে ঘরছাড়াদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। ইরাকের প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষক, বাস্তুকার, চিকিৎসক প্রভৃতি জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা আজ অনেকটা বাধ্য হয়েই দেশছাড়া। ফলে ভেঙে-পড়া জরুরি পরিষেবাগুলি নতুন করে গড়ে তোলাও একপ্রকার অসম্ভব।

অভাব, বেকারি আগেও ছিল। বিদেশ থেকে চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে তার চেহারাও ছিল যথেষ্টই ব্যাপক। কিন্তু অভাবী ব্যক্তিদের জন্য সে সময় সরকার থেকেই নিয়মিত ডোলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে ব্যবস্থাও প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। শুধু তাই নয়, ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ যুদ্ধের ফলে ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু নতুন স্থায়ী বাসস্থানের অভাবে নিজেদের নাম পুনরায় নথিভুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তারাও আজ সেই সামান্য ডোল থেকেও বঞ্চিত। আরও ২৫ লক্ষ মানুষ আজ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

এই ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু সমস্যার সাথে যোগ হচ্ছে অন্যান্য সমস্যাও, যেমন নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা। অসংখ্য উদ্বাস্তু নারী পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হারিয়ে, অন্য কোনও জীবিকার অভাবে এই জীবিকা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বৃদ্ধি পাচ্ছে শিশুদের নিয়ে যৌনতাও। তার অসহায় শিকার অবশ্যই ইরাকের উদ্বাস্তু অসহায় শিশুরা। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল থেকেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। 'উইমেনস্ উইল ইন সিরিয়া'র হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫০ হাজার ইরাকি মহিলা আজ ঘরবাড়ি, স্বামী, সন্তান, সব হারিয়ে নতুন দেশে কোনও রকম সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের পথ খোলা না পেয়ে বাধ্য হয়ে দেহব্যবসায় নেমেছেন। সব মিলিয়ে এই ইরাকে আমরা আজ যা দেখছি, তাকে এক অভূতপূর্ব মানবিক সঙ্কট বলে অভিহিত করা যায়।

অন্যদিকে ইরাক দখলকারী আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কী? তাদের ভাষায়, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সেই ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসেই; কিন্তু এখনও ইরাকে তাদের ১ লক্ষ ৭০ হাজার সেনা মজুত। শুধু তাই নয়, অবস্থা সামাল দিতে তারা এক নতুন পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে ভাড়াটে সেনার ধারণাটিকে নতুন করে তুলে এনে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছে ইরাকের মাটিতে। সে দেশের মাটিতে আজ এইরকম ভাড়াটে সেনার সংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি। এদের ব্যবহার করার নানা সুবিধা আছে। প্রথমত এদের জন্য কোথাও কোনও জবাবদিহির দায় নেই। এদের কার্যকলাপের জন্য না মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ, না ইরাক সরকার — কেউই দায়ী নয়। ফলে এরা ইচ্ছামতো যে কোনও নাগরিককে বন্দী করতে পারে, ইচ্ছামতো তাদের উপর অত্যাচার চালাতে পারে। এমনকী যাকে-তাকে খুনও করতে পারে — কারোর কিছু বলার নেই। ইরাকের মাটিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের গলা টিপে মারার জন্য আজ মার্কিন কর্তৃপক্ষ এদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। কারণ, তাদের কাছেও আজ এ কথা জলের মতোই পরিষ্কার, রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দিয়েই একমাত্র ইরাক থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনকে মুছে ফেলা যেতে পারে, নতুবা ইরাকের মানুষ আর কোনও ভাবেই সে দেশের উপর মার্কিনদের নতুন উপনিবেশবাদী শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

সত্যসত্যই ইরাকের প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা আজ সাংঘাতিক। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী তা শুধুমাত্র কিছু ছন্নছাড়া হিংস্র পাগলামি নয়, বরং যথেষ্ট সুসংগঠিত এক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম, যার তীব্র অভিঘাতে আজ মার্কিনবাহিনীর অবস্থা সত্যসত্যই বেগতিক। ২৩ আগস্ট প্রকাশিত ব্রুকিং ইনস্টিটিউশন রিপোর্টের ইরাক চ্যাপ্টার থেকে দেখা যাচ্ছে, গত বছর প্রতি মাসে প্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা দখলদারি বাহিনী বা তাদের সাহায্যকারী ইরাকের নুরি-আল-মালিকি পুতুল সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উপর গড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার বার, অর্থাৎ প্রতিদিন দেড়শোটিরও বেশি আক্রমণ সংঘটিত করেছে। এইসব আক্রমণে রাস্তায় পাতা মাইন, রকেট আক্রমণ, আত্মঘাতী আক্রমণ, গাড়িবোমা বিস্ফোরণ সবই ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব আক্রমণগুলি কিন্তু প্রচারমাধ্যমে পাওয়া রিপোর্ট মতো আদৌ পারস্পরিক হানাহানির উদ্দেশ্যে চালানো হয়নি। বরং এইসব আক্রমণের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই পরিচালিত হয়েছে দখলদার বাহিনীরই বিরুদ্ধে।

স্বভাবতই এই আক্রমণের মুখে আজ মার্কিন বাহিনীর অবস্থা একরকম দিশাহারাই। ইরাকে সৃষ্ট অভূতপূর্ব মানবিক সঙ্কট তাদেরই সৃষ্ট, আর সাধারণ ইরাকি মানসে সেই কারণেই তাদের প্রতি জমা হয়েছে এত ঘৃণা, যে তারা মার্কিনবাহিনীকে ইরাক থেকে হটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইরাক ছেড়ে আমেরিকাকে পালাতেই হবে, এবং তা নিঃশর্তেই। সেদিনের বোধহয় আর খুব বেশি দেরি নেই।

(সূত্র ঃ সারা ফ্লাউন্ডার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার, আমেরিকা)

বাংলাদেশ থেকে আগত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা

গত ১৪ জানুয়ারি অল ইন্ডিয়া ডি এস ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে, সংগঠনের জেলা দপ্তরে বাংলাদেশ থেকে আগত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র নেতারা সেখানে প্রথমে কমরেড শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জীর হাতে গড়া জয়নগরের প্রখ্যাত ক্লাব শান্তি সংঘ এবং সংঘের লাইব্রেরি ও দক্ষিণী পুরাকীর্তির সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। এরপর এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা কনভেনশন যেখানে হয়েছিল সেই বাসন্তী নাট্যমন্দির, অধুনা রূপ-অরূপ মঞ্চ ঘুরে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের আবক্ষ মূর্তির সামনে যান। সেখানে এ আই ডি এস ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি কমরেড বিশ্বনাথ সরদারের নেতৃত্বে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁরা অগ্নিযুগের এই বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

সংবর্ধনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। সভায় এ আই ডি এস ও সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ি, অফিস সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড বিশ্বনাথ সরদার। জেলা এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন সভাপতি কমরেড কুমকুম সরকার ভাড়াবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের শহীদ কমরেড মাধাই হালদারের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ আই ডি এস ও জেলা সম্পাদক কমরেড রামকুমার মণ্ডল শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্যের ছবি সম্বলিত স্মৃতিফলক বাংলাদেশের ছাত্র নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দেন। সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কমরেড ফকরুদ্দিন কবির আদিক। তিনি বলেন, এস ইউ সি আই দলের ১৪৮ জন কর্মীহত্যা ও শত শত কর্মী-সংগঠককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণই যে এই অঞ্চলের পার্টিকে লালন-পালন করছেন — কমরেড ইয়াকুব পৈলানের এই বক্তব্য ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা দেয়।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করে চলেছে, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টও তার পরিপূরক ছাত্র আন্দোলন সে দেশে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক কমরেড মেহেদি হাসান বলেন রাজনৈতিক লড়াইয়ের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক লড়াইও চালাতে হবে। ঐ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড খায়রুন্নেসা সরকার বলেন, কলেজে কলেজে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃত্বে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। বাংলাদেশের ছাত্রীরাও রক্ষণশীল মৌলবাদী সমাজের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছাত্র ফ্রন্টের সাথে যুক্ত হচ্ছে ও ফ্রন্টের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। এ আই ডি এস ও'র অল ইন্ডিয়া কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস বলেন, এই সভা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ছাত্র ঐক্য আরও সুদৃঢ় হওয়ার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভার সভাপতি কমরেড বিশ্বনাথ সরদার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সর্বত্র প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষার উপর নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দ্রুত কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা বিস্তৃতভাবে বলেন।

সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন

একের পাতার পর

বরং সম্মেলন জুড়ে পুঁজিরই জয়গান গাওয়া হল, পুঁজিবাদী রাস্তাই উন্নয়নের একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করা হল। 'শিল্পায়ন' এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের সরকারি সিদ্ধান্তে দলীয় সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী নাটকীয় ঢঙে বললেন, দেশের শিক্ষিত বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য আমরা কি সমাজতন্ত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করব? অর্থাৎ কর্মসংস্থানের জন্যই যেন দেশি-বিদেশি পুঁজিকে আবাহন করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। সম্মেলনে প্রতিনিধিরা তাঁদের ন্যূনতম মার্কসীয় জ্ঞান থেকেও এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন না যে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল যুগে পুঁজির বিনিয়োগে আজ আর তেমন কর্মসংস্থান তো সম্ভব নয়ই, বরং কর্মহারার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা কি এ কথা জানেন না যে, আজ একটা নতুন কারখানা খুললে বাজার সংকটে আরও একশ'টা কারখানা বন্ধ হচ্ছে, নতুন কারখানায় ১০ জন কাজ পেলে বন্ধ কারখানায় কয়েক হাজার জন কাজ হারাচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং একচেটিয়াকরণের ফলে আজকের যুগে পুঁজিবাদী পথে আর অতীতের মতো কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ আজ আর কোনওভাবেই বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এই রকম পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিকাশের কথা বলা এবং তার দ্বারা কর্মসংস্থানের কথা বলা মানেই হচ্ছে, এই মুমূর্ষু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে মিথ্যা মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করা। আজকের দিনে এ কাজ যারা করে, তারা কি শ্রমিক-কৃষক-শোষিত মানুষের বন্ধু, নাকি শত্রু?

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুঁজির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বললেন, তিনটি রাজ্যে ক্ষমতায় গিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় না। যেন রাজ্যের জনগণ তাঁদের কাছে সমাজতন্ত্র প্রত্যাশা করে, বা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন! সম্মেলনে প্রতিনিধিরা বিতর্ক তুললেন না যে, ভারতের মতো একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় গিয়ে যে সমাজতন্ত্র ঘোষণা করা যায় না, তা বোঝার জন্য যেমন মহাজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই, তেমনই এর দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় না যে, যেহেতু তিনটি রাজ্যে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে না, তাই মালিকশ্রেণীর দালালি করতে হবে। এ রাজ্যে '৬৭-'৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর দল একটি রাজ্যেও ক্ষমতায় গেলে কীভাবে তাকে শোষিত মানুষের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে, কীভাবে গণআন্দোলনকে রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে তার বিকাশের সুযোগ করে দিতে পারে। সেদিন যুক্তফ্রন্ট সরকার সমাজতন্ত্র লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেনি। শ্রমিকশ্রেণী সহ শোষিত মানুষের চেতনা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনকে উৎসাহিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই যুক্তফ্রন্ট আমলে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল; ঘুম ছুটে গিয়েছিল পুঁজিপতিশ্রেণীর। বিপরীতে সিপিএমের তিরিশ বছরের শাসনে গণআন্দোলন গড়ে তোলা তো দূরের কথা, এস ইউ সি আই-এর মতো বামপন্থী দল যতটুকু গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে, তাকে তারা পুলিশ দিয়ে, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে রক্তাক্ত করেছে, দমন করেছে।

তা ছাড়া একটি যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর দল কখনও সমাজতন্ত্রকে সুদূর ভবিষ্যতের বিষয় বলে ঘোষণা করে পুঁজিবাদের পক্ষে ওকালতি করে না, সরকারে থাকার জন্য পুঁজিপতিদের পদলেহন করে না। যদি তা হয়, তবে বুঝতে হবে, সেটি আদৌ শ্রমিকশ্রেণীর দল নয়, শ্রমিকশ্রেণীর কথা বলে তা আসলে একটি পেটিবুর্জোয়া দল, যারা শেষপর্যন্ত পুঁজির স্বার্থই রক্ষা করে এবং বুর্জোয়া শাসন ক্ষমতার আস্বাদ পেতে বা সেই ক্ষমতার সময়কালকে দীর্ঘায়িত করতে নানা কথার মারপ্যাঁচে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বলে দেখাতে চায়। এঁদেরকে চিহ্নিত করেই মহান এঙ্গেলস তাঁর 'দি হাউজিং কোশ্চেন' লেখায় বলেছিলেন, "... **সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেই এক ধরনের পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব ঘটে। তাদের চিন্তাধারা এ রকম ঃ আধুনিক সমাজতন্ত্রের মূল ধ্যান-ধারণাকে সঠিক এবং উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলোর সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরের দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে তারা সুদূর ভবিষ্যতের বিষয় রূপে ঘোষণা করে, এবং বলে সেটা এমন এক ভবিষ্যৎ, বাস্তব কাজকর্মের ক্ষেত্রে যার কোনও চিহ্নই নাকি এখন দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব তাদের মতে, বর্তমানে নানা সামাজিক প্রশ্নে নিছক জোড়াতালি দেওয়ার রাস্তাতেই চলতে হবে এবং সেজন্য 'শ্রমজীবীশ্রেণীর' তথাকথিত 'উন্নয়নে'র নামে চরম প্রতিক্রিয়াশীল কোনও প্রচেষ্টাকেও সমর্থন দেওয়া যেতে পারে।**"

বিশ্বজুড়েই পুঁজিপতিশ্রেণী আজ তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর পুঁজিবাদী শিবিরে যে উল্লাস দেখা গিয়েছিল, তা মিলিয়ে যেতে দেরি হয়নি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিশাল বাজার পুঁজিবাদী বাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের বাজার সংকট নিরসনের স্বপ্নও আজ আর কোনও পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক দেখেন না। বরং পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অধঃপতিত হয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে পুঁজিবাদী বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়েছে এবং পুঁজিবাদী বাজার সংকটকে আরও তীব্র করেছে। এই অবস্থায় তীব্র বাজার সংকট থেকে রেহাই পেতে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— যার অন্যতম নজির হল, রাষ্ট্রের পূর্ণ মদত ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'সেজ' গঠনের মধ্য দিয়ে একদিকে শ্রমিক শোষণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নির্বিচারে ধ্বংস করে মুনাফার পাহাড় তৈরি করা। এই চেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও ক্রমান্বয়ে সেজ স্থাপন চলছে। তার জন্য পুরনো আইন বদলে ফেলা হচ্ছে, নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। কোনও প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে সরকার তোয়াক্কা করছে না, রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এইরকম অবস্থায় রাজ্যের নন্দীগ্রামেই বোধহয় প্রথম বিশ্বে সরকার ও দেশি-বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের কৃষিজমি দখল করে, বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করে সেজ গঠনের চেষ্টাকে রুখে দিল সাধারণ মানুষ। এর জন্য তাঁদের বহু প্রাণ দিতে হয়েছে, বহু নারীর সম্ভ্রম গেছে, বহু সম্পত্তিহানি হয়েছে, রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সিপিএম নেতারা বহুকাল ধরেই তাঁদের ফ্রন্ট-সরকারকে মডেল বলে প্রচার করে এসেছেন। নন্দীগ্রামের জনগণ রক্ত দিয়ে দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করে দিল, ওটা লাল ঝান্ডার আড়ালে নির্মম পুঁজিবাদী শোষণ চালাবার মডেল। এবং এর মধ্য দিয়েই বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের কাছে সত্যিকারের মডেল হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম।

শুধু এ রাজ্য নয়, গোটা দেশ, এমনকী বিশ্বের মানুষ যখন নন্দীগ্রামের সংগ্রামকে অন্তরের গভীর থেকে সমর্থন জানাচ্ছেন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, তখন শোষিত মানুষের এই অনন্য সংগ্রামকে কী চোখে দেখল সিপিএমের সম্মেলন? সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নয়া ছক সেজ গঠনের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামবাসীর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে রাজ্য সরকার যে নৃশংসতায় দমন করতে চেয়েছে, তার বিরুদ্ধে কি তীব্র ক্ষোভ এবং ঘৃণায় ফেটে পড়েছিলেন প্রতিনিধিরা? মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের নেতাদের কি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন? প্রশ্ন তুলেছেন কি, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মুনাফার লালসা চরিতার্থ করতে কেন দেশের গরিব মানুষের জীবন বলি দেওয়া হবে? দলে বামপন্থার লেশমাত্র থাকলে এ নিয়ে সম্মেলন তোলপাড় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বাস্তবে সে সব কিছুই হল না, নেতাদের এড়িয়ে পুলিশের দিকে আঙুল তুলেছেন কিছু প্রতিনিধি। বরং সিপিএম নেতারা যে পুঁজিবাদী বিকাশের নতুন স্লোগান তুলেছেন, তারই অঙ্গ হিসাবে সেজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সম্মেলনে। অভিনন্দন জানানো হয়েছে পার্টির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটিকে, যাদের নেতৃত্বে সেলিম-তপন-সুকুরের মতো গোটা রাজ্যের সমাজবিরোধীদের একত্রিত করে নন্দীগ্রামে খুন-সন্ত্রাস-ধর্ষণ, দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে। ফলে রাজ্যের মানুষ এই সম্মেলন থেকে কী-ই বা আর আশা করতে পারেন!

খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে। এইরকম একটি গুরুতর সমস্যার বিরুদ্ধে রুটিনমাফিক প্রস্তাব পেশ ছাড়া আন্দোলনের কোনও কর্মসূচির, বা যথার্থ প্রতিকারের কোনও উল্লেখ সম্মেলনে নেই। শুধুমাত্র কৃষিপণ্যের আগাম বাণিজ্যে ফাটকা পুঁজির অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপি-কংগ্রেসে কোনও ফারাক নেই বলে সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে বড় ব্যবসায়ীদের লাভ হলেও সাধারণ ক্রেতাদের সর্বনাশ হয়েছে— তা স্বীকার করা হয়েছে। এ ধরনের মামুলি স্বীকৃতি তো মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী যে পুঁজিপতিশ্রেণী, তাদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস-

আটের পাতায় দেখুন

ওড়িশায় কমরেড তাপস দত্ত স্মরণসভা

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত স্মরণে, রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১৯ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরের পি এম জি স্কোয়ারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন ওড়িশার সকল অংশ থেকে হাজার হাজার পার্টিকর্মী ও সমর্থক ওড়িশার অবিসংবাদী জননেতা, প্রিয় তাপসদার স্মৃতির উদ্দেশে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সভায় যোগ দেন। সভার সূচনাতেই কমরেড তাপস দত্তের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও স্মরণসভা উপলক্ষে কমরেড তাপস দত্তের উপর রচিত দুটি গান পরিবেশন করেন সঙ্গীতগোষ্ঠী।

সিপিআই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আশিস মহাপাত্র, কমরেড তাপস দত্তের সাথে তাঁর নিজের দীর্ঘ সম্পর্কের দিনগুলির কথা স্মরণ করে বলেন, আজ ওড়িশার শ্রমজীবী জনগণের যখন কমরেড তাপস দত্তকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখনই তাঁর জীবনাবসান ঘটল। সিপিআই(এম) ওড়িশা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জগন্নাথ মিশ্র ও সিপিআই(এম এল) রাজ্য সম্পাদক কমরেড ক্ষিতি বিসোয়ালও ওড়িশায় বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার

ভুবনেশ্বরে কমরেড তাপস দত্তের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

ক্ষেত্রে কমরেড তাপস দত্তের ভূমিকা ও পাশাপাশি তাঁর শিল্পপ্রতিভার কথা স্মরণ করেন।

কীভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে সমস্ত দিক থেকে উপলব্ধি করার ও তার মর্মবস্তুকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কমরেড তাপস দত্ত সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছেন— তার বিশদ আলোচনা করেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। জীবনব্যাপী অত্যন্ত কঠিন কঠোর এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় কমরেড তাপস দত্ত নিজেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার একজন যোগ্য পতাকাবহনকারীর পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হন। কমরেড তাপস দত্তের বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে সভায় উপস্থিত হাজার হাজার পার্টিকর্মী-সমর্থক-দরদীদের যোগ্যতার সাথে বহন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে কমরেড চক্রবর্তী বক্তব্য শেষ করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

ভিতরের দৈন্য ঢাকা যাচ্ছে না

সাতের পাতার পর

বিজেপির সম্মেলনেও থাকে। একটি বামপন্থী দলের দায়িত্ব কি শুধু প্রস্তাব পেশ, আর দুরবস্থার বর্ণনাতেই শেষ হয়ে যায়? তাহলে বুর্জোয়া দলগুলির সাথে পার্থক্য কি থাকে?

কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কিছু ভাসাভাসা কথা ছাড়া কৃষির মূল সমস্যা যে সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষিসরঞ্জামের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং বিপরীতে ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া— এগুলির সমাধানের জন্য কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা নিয়ে সম্মেলনে কিছু বলা হয়নি। কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশে যে এ রাজ্যের সরকারই অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিরা সোচ্চার হলেন না কেন? বরং যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে রাজ্যে উপনগরী, বহু লেন এক্সপ্রেসওয়ে, বৃহৎ পুঁজির কারখানার জন্য কৃষকের জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে কী সাফল্য এসেছে তারই ফিরিস্তি দিয়ে তাকেই কৃষক আন্দোলনের সাফল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনেও শ্রমিকশ্রেণীর উপর মালিকশ্রেণীর একতরফা আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করার ডাক নেই। সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে, এমনকী রাজ্য সরকারি সংস্থার ঠিকা শ্রমিকরাও ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেন না। সেখানে শ্রমিক সংগঠন সিটু সর্বত্রই শ্রমিকস্বার্থের বিরুদ্ধে মালিকদের দালালের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কোনও বিক্ষোভ কি সম্মেলনে ধ্বনিত হয়েছে? দেশজুড়ে ছাঁটাই, মজুরি কমানোর বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা সম্মেলনে নেই। বরং শ্রমিকশ্রেণীকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার কথা— অর্থাৎ মালিকের ছাঁটাই, কম মজুরি নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ কি সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা বোঝেন না? এর অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকশ্রেণীর মুনাফা নিশ্চিত করার পক্ষেই সরাসরি সওয়াল করা।

ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং ভারতের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের ছোট শরিক হওয়ার দৌড়ে সামিল হওয়ার বিরোধিতা সম্মেলনের প্রস্তাবে উল্লেখ করা হলেও, এ রাজ্যে প্রথমে কলাইকুণ্ডায় যৌথ বিমান মহড়া, পরবর্তীকালে বঙ্গোপসাগরে যৌথ নৌমহড়াই প্রমাণ করে বাইরে বিরোধিতার বুলি আউড়ে ভিতরে ভিতরে কতখানি সমঝোতা চলছে। তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এই বিশেষ কায়দাটিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার 'কলাইকুণ্ডা স্টাইল' হিসাবে যেমন দেশের মানুষ জানেন, তেমনই পুঁজিপতিশ্রেণীও এই স্টাইলে বেশ নিশ্চিন্ত।

বাস্তবে কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকার টিকিয়ে রাখতে সিপিএমের সমর্থন যেমন কংগ্রেসের প্রয়োজন, তেমনই এ রাজ্যে সরকারের যে কোনও অন্যায় কাজকে সমর্থন জুগিয়ে যাওয়াও কংগ্রেসের দায়িত্ব। সিঙ্গুরে কৃষকদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে উর্বর কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া এবং নন্দীগ্রামে গণহত্যা চালানোর পরও কংগ্রেস যে টুঁ শব্দ করল না, তা কি এই সমঝোতারই ফল নয়? স্বাভাবিকভাবেই সেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের অনুসৃত বিশ্বায়নী নীতির বিরুদ্ধে এর থেকে বেশি কিছু বলা সিপিএমের পক্ষে সম্ভব কি? কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন করে যাব, বিনিময়ে রাজ্যের গদি রক্ষার প্রতিশ্রুতি পাব, আবার সেই কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করব, এমন সোনার পাথরবাটির কথা সিপিএম নেতারা তাদের দলীয় সম্মেলনে শোনাতে পারেন, বাস্তবটা যে সম্পূর্ণ উল্টো তা বুঝতে রাজ্যের মানুষের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, সম্মেলন কিছু বাগাড়ম্বর ছাড়া অশ্বডিম্ব প্রসব করবে। তাই সম্মেলনে যত সমারোহ, যত আড়ম্বরই থাক না কেন, তা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সম্মেলন চলাকালে সাধারণ মানুষ বাসে-ট্রামে-চায়ের দোকানে কোথাও এ নিয়ে কোনও আলোচনা শোনা যায়নি। অথচ সংবাদমাধ্যমগুলিতে সম্মেলন নিয়ে কম-বেশি খবরের অভাব ছিল না।

কোনও দিক থেকেই এই সম্মেলনে যেমন দেশের শোষিত মানুষ, শ্রমিক-কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রতিফলিত হয়নি, তেমনই সিপিএমের যে সৎ অংশ, যাঁরা একদিন সমাজপরিবর্তনের, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁদের ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দলটি গড়ে উঠেছে, তাঁদের স্বপ্নের মর্যাদাও সম্মেলন রক্ষা করেনি। কাজে শোষিত মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে, মালিকশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করা এবং কথায় শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের কথা বলা— এই দ্বিচারিতাই এখন সিপিএম দলটির চরিত্রবৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সিপিএম নেতারা একেবারে কাগজে-কলমেই পুঁজিবাদের পদলেহন করার সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন, পুঁজিবাদ কত ভাল তা জনগণকে বোঝাবার দায়িত্বও নিতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি করার কিছু নেই। দেশে কংগ্রেস-বিজেপি সহ অনেক দলই সে দায়িত্ব পালন করছে। আপত্তিটা এখানেই যে সিপিএম নেতারা নিজেদের মার্কসবাদী বলছেন। তাঁরা মার্কসবাদী বলা ছেড়ে দিন, আদর্শ নীতি নিয়ে কোনও আলোচনা পর্যালোচনার দরকার পড়বে না। পরিশেষে বলতেই হয়, নীতি-আদর্শের ক্ষেত্রে সিপিএমের ভিতরের দৈন্য এতই গভীর যে বাইরের আড়ম্বর দিয়ে তাকে আর ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না।

শিক্ষক সভা থেকে আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত

সিঙ্গুরে কৃষক উচ্ছেদ করে টাটার কারখানা নাহলে নাকি বেকারদের কাজ দেওয়া যাবে না। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব না হলে নাকি রাজ্যের উন্নয়ন থমকে যাবে — এমনই প্রচার সিপিএমের এবং এই প্রচারে রাজ্যের মানুষের একাংশ সিপিএমকে কর্মসংস্থানের কল্পতরুরূপে ভাবছেনও। কিন্তু প্রশ্ন হল, ৫০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকপদ পূরণ না করে কেন বছরের পর বছর শিক্ষিত বেকারদের প্রতারিত করা হচ্ছে? প্রশ্ন উঠেছে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায়। সমিতি অবিলম্বে ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গত ২৩ জানুয়ারি কলকাতার থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন জেলা ডেকে ২১৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি যোগ দেন। সভার প্রধান বক্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা রাজ্যের শিক্ষার মানের চরম অবনমনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারি শিক্ষানীতিকেই দায়ী করেন। সভাপতিত্ব করেন তপন রায়চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে অজিত হোড়, কুশধ্বজ মণ্ডল, তপতী মিত্র, সহদেব নস্কর বক্তব্য রাখেন।

সভায় শিক্ষকদের মাস পয়লা বেতন দান, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তন, জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ চালু করা, মিড-ডে মিলে শুকনো পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, অবসরের দিনই পেনশন-গ্র্যাচুইটি, পি-এফ প্রদান, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ এবং পিটিটিআই ছাত্রদের সমস্যার অবিলম্বে সমাধানের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচিও গৃহীত হয়।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী

কেন্দ্র		প্রার্থী
আগরতলা	—	কমরেড শিবানী দাস
বাধারঘাট	—	কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী
ধর্মনগর	—	কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী
রাধাকিশোর পুর	—	কমরেড বিভুলাল দে

পিটিটিআই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর নির্লজ্জ মিথ্যাচার

এই প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রের দৃপ্ত মিছিল ও অবরোধের সাক্ষী হয়ে রইলো সল্টলেক, যখন গত ২৪ জানুয়ারি পিটিটিআই ছাত্রছাত্রীদের অনড় মনোভাবের ফলে শেষপর্যন্ত স্কুলশিক্ষামন্ত্রী বাধ্য হলেন ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে। রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অবহেলার শিকার এ রাজ্যের ১৩৮ পিটিটিআই কলেজের প্রায় ১৬ হাজার সহ আরও প্রায় ৭৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ। দীর্ঘ ২ বছর ধরে মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ, ঘেরাও-অবরোধ ও অনশন প্রভৃতি চললেও হাইকোর্টের অজুহাতে সরকার প্রায় ২ বছর ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি এড়িয়ে চলেছে।

গত ২৪ জানুয়ারি প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের সভাপতির সাথে দেখা করতে যান। এই সূচি পূর্বনির্ধারিত থাকলেও সভাপতির অবর্তমানে পর্ষদের সেক্রেটারি ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন। এরপর ছাত্ররা মিছিল করে বিকাশভবনে যান এবং স্কুল-শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে, যাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ছাত্রছাত্রীরা আজ রাস্তায়, তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেন। ছাত্ররা প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। শুরু হয় বিকাশভবনের সামনে অবরোধ। টানা আড়াই ঘণ্টা রাস্তা অবরোধের পর মন্ত্রী বাধ্য হয়ে ছাত্রপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন এবং জানান, আগামী ২৫ জানুয়ারি হাইকোর্টে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে সরকারি উকিলের সাথে তাঁর কথা হয়েছে ও আশ্বস্ত করেন মামলা নিষ্পত্তি করেই রাজ্য সরকার এনসিটিই'র প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করবেন।

অথচ ২৫ জানুয়ারি ছাত্ররা হাইকোর্টে গিয়ে দেখেন, ২৪ জানুয়ারি বিকেলে সরকারি উকিলের তৎপরতায় ছাত্রছাত্রীদের ঐ মামলা স্থগিত হয়ে যায় আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সরকারের কী নির্লজ্জ পরিহাস! মন্ত্রী একদিকে যখন ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করছেন সমস্যা সমাধান হবে বলে, তখন সেই মন্ত্রী আবার সরকারি উকিলকে দিয়ে মামলা বারংবার পিছিয়ে দিচ্ছেন।

ডব্লু বি পি টি টি এস ইউ -এর সভাপতি আনন্দ হাণ্ডা এবং সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এই ঘটনায় সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান।

কিউবা নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী

গত ২০ জানুয়ারি কিউবায় অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ মানুষ কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির ৬০১ জন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লিতে নির্বাচিত করেছেন।

নির্বাচনের আগে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়া — 'কিউবায় গণতন্ত্র নেই, নির্বাচন প্রহসন' বলে যে প্রচার করেছিল তার বিরুদ্ধে ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে কিউবান এমব্যাসিতে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমাদের দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দলের প্রতিনিধি হিসাবে পার্টির কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ভারতস্থ কিউবান রাষ্ট্রদূত মিগুয়েল এঞ্জেল রামিরেজ রামোস।

ভাগলপুরে গুলি চালিয়ে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ভাগলপুর জেলার কহলগাঁওয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও গত ২০ বছর ধরে বিদ্যুৎ পান না এলাকার মানুষ। গত ১৮ জানুয়ারি বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভরত নিরস্ত্র মানুষের ওপর পুলিশ নির্বিচার লাঠি গুলি চালায়। গরিব গ্রামবাসী মহম্মদ আসলামকে বাড়িরে বাইরে নিয়ে এসে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করেন স্বয়ং ডি এস পি। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র বমবম কুমারকে বাজারের মধ্যে কপালে গুলি করে মারা হয়। এছাড়াও গুলিতে কারও কিডনি নষ্ট হয়েছে, কারও পা। লাঠির আঘাতে পঙ্গু অসংখ্য। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সারা বিহার জুড়ে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছে। ছবি ঃ পাটনা, ১৯ জানুয়ারি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in